স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
২০ জুন, ২০১১, ৫ আষাঢ় - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা

কংগ্রেসের রোষানলে বাবা রামদেব

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

মহাকরণে প্রেস কর্নার, প্রতিশ্রুতি রাখবেন তো মমতা? ❑ ৮

সিপিএমের অস্ত্রাগার উদ্ধার, গুম-হত্যার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে ❑ ৯

কর্ণাটকে রাজ্যপালের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑ ১১

ভারত যেন একটা হট্টগোলমুখর বিয়েবাড়ি ❑ ডঃ জয় দুবাসী ❑ ১৩

বাবা রামদেবের ওপর সরকারি হামলা ❑ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ❑ ১৪

যোদ্ধা সন্ন্যাসী রামদেব বেকায়দায় ফেলেছেন ঠিকাদার রাজনীতিকদের ❑ অমলেশ মিশ্র ❑ ১৬

মমতা ও মুসলিম, উভয়ের মদতে উভয়েই লাভবান ❑ ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায় ❑ ২০

সংশয় যাচ্ছে না 'পরিবর্তনে'ও ❑ দেবশ্রী চৌধুরী ❑ ২১

ষোড়শ মহাজনপদ — মল্ল ❑ গোপাল চক্রবর্তী ❑ ২৪

মালদার তুলসী বিবাহ মেলায় ঘোড়দৌড় ❑ তরুণকুমার পণ্ডিত ❑ ২৪

অযোধ্যায় অস্থায়ী মন্দিরে স্বমহিমায় রামলালা ❑ ২৫

রূপসী তাওয়াং ❑ নিমাই মুখার্জী ❑ ২৫

সাক্ষরতায় এগিয়ে মহিলারাই ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৭

কংগ্রেসীদের জাতির জনক গান্ধী না জিন্না? ❑ ৩০

নাদাল কি বর্গের সমকক্ষ হতে পারবেন? ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

এই সময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **উত্তর-পূর্বাঞ্চল : ১৯** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **জনমত : ২৩** ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-২৯** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

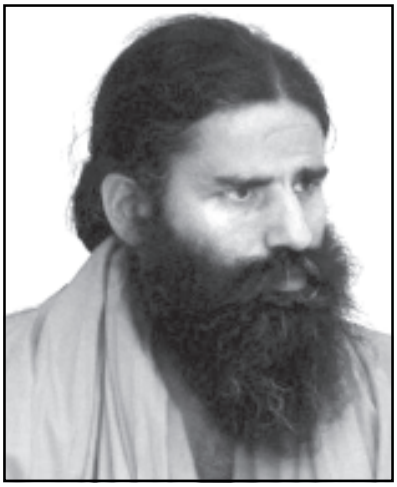

দুর্নীতিগ্রস্ত ও ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসের রোষানলে বাবা রামদেব — ১৪-১৬

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ৫ আষাঢ়, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২০ জুন - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের আর এস এস ভীতি

হঠাৎই আমরা দেখিলাম, কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা সাংসদ মনীশ তেওয়ারী সমাজকর্মী ও গান্ধবাদী নেতা আন্না হাজারে-কে 'ফ্যাসিস্ট' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলে শ্রী তেওয়ারী হাজারের আন্দোলনের মধ্যে ফ্যাসিজিমের কিছু লক্ষণ (Elements of Fascism) দেখা যাইতেছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন। সোনিয়া গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে অধিকৃতভাবেই যে তিনি দলের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ইহাতেই স্পষ্ট। দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজনৈতিক দল হিসাবে শ্রীহাজারের বিরুদ্ধে এমন নিম্নস্তরের বিদ্বেষপরায়ণ আক্রমণ শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, জরুরী অবস্থার দিনগুলির দিকে তাকাইয়া কংগ্রেস যে কিছুমাত্র বিবেকের তাড়না বোধ করিতেছে এমন মনে হয় না। শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস দুর্নীতিমূলক কাজকর্মকে উপেক্ষা করিয়া যে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে শ্রীহাজারে দেশের মানুষকে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। তাই কিসের ভিত্তিতে আন্না হাজারের মতো ব্যক্তিকে 'ফ্যাসিস্ট' বলিয়া চিহ্নিত করা হইল—ইহার জবাব শুধু তেওয়ারী বা কংগ্রেস নয়, দলের প্রধান সোনিয়া গান্ধীকেও দিতে হইবে। কারণ কি ইহাই যে শ্রী হাজারে সরকারের খেয়াল এবং নির্দেশের কাছে মাথা নোয়াইতে রাজী হন নাই? কারণ কি এইটাই যে শ্রী হাজারে ও তাঁহার অনুগামীরা লোকপাল বিল প্রণয়নের দাবী জানাইয়াছিল যাহা উচ্চস্তরে দুর্নীতি রুখিতে ফলপ্রসূ হইবে। কারণ কি এইটাই যে তিনি কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন?

কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিন্দাযোগ্য বিষয় হইল আন্না হাজারে ও বাবা রামদেবের আন্দোলনের সঙ্গে আর এস এসের নাম জড়িয়ে দেওয়ার কূট-কৌশলী অপচেষ্টা। সম্প্রতি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনশনরত রামদেবের আন্দোলনের পিছনে আর এস এসের ভূত দেখিয়াছেন। সমাজের শুভ পরিবর্তনের জন্য যাঁহারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিবেন সঙ্ঘ তাঁহাদের সর্বপ্রকারে সহায়তা করিবে বলিয়া গত মার্চ মাসেই প্রতিনিধি সভার বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সূত্রে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী সকল স্বয়ংসেবককে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত আন্না হাজারে ও বাবা রামদেবের প্রয়াসকে সফল করিবার জন্য সহায়তার কথাও বলিয়াছিলেন। বস্তুত ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক মাত্রই দুর্নীতি রোধের বিষয়ে যে সোচ্চার হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে কাহার কি রঙ তাহা দেখিবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে এই জন-আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখিয়া কংগ্রেস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে দিল্লীর সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ-এর সভাপতি তথা রাজনীতি বিশেষজ্ঞ প্রতাপ ভানু মেহেতার বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। আর এস এসের সঙ্গে কগ্রেসের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—আর এস এস-কে লইয়া কংগ্রেসের সম্বন্ধে একটি পুরনো গুজব আছে। নিজেদের দেউলিয়াপনা আড়াল করিতেই কংগ্রেস আর আর এস-র তাস ব্যবহার করিয়া থাকে। যখন কংগ্রেসের কাছে আর কোনও কর্মসূচী কার্যক্রম বা যুক্তি থাকে না তখনই এই আর এস এস-বিরোধী তাসটি খেলিয়া থাকে। আর এস এসের সম্পর্কে যে ভীতিটা এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাই কাজে লাগাইবার আশায় এমনটা করা হইয়া থাকে। জাতীয় মানসকে বুঝিবার ক্ষেত্রে ইহা এক ভয়ঙ্কর ব্যর্থতা।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

একটা বিষয় অবশ্যই জেনে রাখা দরকার যে বিশ্বজনীন ঐক্য ও কল্যাণের কথা আধুনিক কোনও চিন্তাবিদ উচ্চারণ করেননি। আজ থেকে বহু বছর পূর্বে—সুদূর অতীতকালে যখন প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের সূত্রপাত পর্যন্ত হয়নি তখন এদেশের সাধু-সন্তরা দার্শনিকরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে গভীর তথ্যানুসন্ধান করে গেছেন। অবিস্মরণীয় কাল থেকে মুক্ত পৃথিবী ও মানব ঐক্যের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

—শ্রীগুরুজী

বিভিন্ন সামাজিক কাজে ৪৭ লাখ টাকা দান প্রয়াত উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ক্লাস হোত কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস থেকে দূরে কাশীপুরে রাজা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরদের বাগানবাড়ি এমারেল্ড বাওয়ার-এর একটা অংশে। সেই 'মরকতকুঞ্জ'-এ যেসব বিখ্যাত অধ্যাপক পড়িয়েছেন তাঁদের অন্যতম সন্তোষ ভট্টাচার্য। বামপন্থায় বিশ্বাসী হলেও তাঁর কাছে বড় ছিল কর্তব্যনিষ্ঠা। পঠন পাঠনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকের অপছন্দের কারণ হলেও নিজের মত ও সিদ্ধান্তে স্থির থেকেছেন বরাবর। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সুনামের সঙ্গে যাঁদের নাম জড়িয়ে আছে তার মধ্যে রয়েছেন সন্তোষ ভট্টাচার্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁর নাম পছন্দ করেছিলেন রাজ্যপাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপাল ঠিক করেন কে উপাচার্যের আসনে বসার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ লক্ষ টাকা

অধিকারী। সন্তোষ ভট্টাচার্য উপাচার্য হন—এটা রাজ্যের শাসক দল সিপিএমের পছন্দ হয়নি। কারণ তিনি সিপিএম দলের স্ট্যাম্প অনুযায়ী কাজ করতে রাজি হবার মতো মানসিকতার অধিকারী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে সংঘাত বাধে। সিপিএম দলের প্রত্যক্ষ মদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের একটা অংশ উপাচার্যকে নিজের ঘরে বসে কাজ করতে দেয়নি। দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করেছে সিপিএম-এর বশংবদ লোকজন। সিপিএমের উদ্দেশ্য ছিল উপাচার্যকে ঘেরাও আর গালমন্দ করে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো। অনেকরকম বদ মতলব ছিল তলে তলে। শেষে সন্তোষ ভট্টাচার্য রেগেমেগে পদত্যাগ করবেন—এটা চাইছিল সিপিএম।

কিন্তু সন্তোষ ভট্টাচার্য নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরেননি। ঠিক সময়ে অফিসে এসেছেন। গাড়ি থেকে নামতে পারেননি। গাড়িতে বসে থেকেছেন। তারপর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়েছেন। দিনের পর দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সিপিএম তার জেদ বজায় রেখেছে। সন্তোষ ভট্টাচার্যও নিজের নীতিতে স্থির থেকেছেন। সিপিএমের জঙ্গি বাহিনীর এ এক মস্তবড় পরাজয়। উপাচার্য থাকার পুরো সময়টা ওইভাবে কেটেছে যাঁর তিনি কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর মতো এই দৃঢ়চিত্ততা আজ সবক্ষেত্রে জরুরি—একথা অনেকে বলেছিলেন।

সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রয়াত হয়েছেন কয়েক মাস আগে। কদিন আগে আমাদের কাছে এখন খবর এলো, যা তাঁর মহৎ হৃদয়ের একটি পরিচয়। তাঁর সঞ্চয়ের ৪৭ লক্ষ টাকা বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে যাওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন। সেই ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর স্ত্রী আরতি ভট্টাচার্য দশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন ৮ জুন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সেই টাকা শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালের উন্নতির কাজে লাগানোর জন্যে ইচ্ছে ছিল সন্তোষ ভট্টাচার্যের। ১৫ লক্ষ টাকা দান করা হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানকে। ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও মেট্রোপলিটন স্কুল মেইনকে পাঁচ লক্ষ করে টাকা দিয়ে গেছেন। এমনকী নিজের ব্যক্তিগত সহকারীকে দিয়েছেন দু লক্ষ টাকা।

ভাবতে পারেন, এমন একটি মানুষের বিরুদ্ধে সিপিএম দল কি ধরনের আচরণ করেছিল? বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি হলেও সব কিন্তু ভোলে না।

তৃণমূলী মুসলিম দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব গড়বেতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর একমাসও কাটলো না; গত ৯ জুন গড়বেতার ১নং ব্লকের ১নং অঞ্চলের উত্তরবিল এলাকার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম ন্যাকরাশোলে নৃশংস তান্ডব চালাল মুসলিম দুষ্কৃতীরা। আর তাদের মদত যোগাল ডা: মুজিবর, আইনালের মতো স্থানীয় তৃণমূলীরা। প্রসঙ্গত, জনযুদ্ধগোষ্ঠীর সঙ্গে সিপিএমের সমঝোতা হবার অব্যবহিত পরেই সিপিএমের দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী তপন ঘোষ ও সুকুর আলির সঙ্গে ডা: মুজিবর, ওসমানের মতো তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদেরও একটা গোপন চুক্তি হয়। যে কারণে ২০০০ সালের ২৫ জুন গড়বেতা থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হন তৃণমূল-বিজেপি কর্মীরা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেদিনের সেই বিশ্বাসঘাতকরাই আজ ওখানকার তৃণমূলের সর্বেসর্বা। ১৯৯৮-২০০০ সালে গড়বেতা, ছোট আঙারিয়া প্রভৃতি এলাকায় বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সিপিএমের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সময়ও ৫-৭ জন বিজেপি কর্মীকে আগুনে পোড়ানো হয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৯ জুন সকাল ৯টা-১০টা নাগাদ। গত ১৫-২০ বছর আগে সিপিএমের পঞ্চায়েত হিন্দু প্রধান এলাকায় অল্প কিছু জমির পাট্টা বিলি করে। ওইদিন আচমকাই সিপিএমের কায়দায় ৩০-৩২টা মোটরবাইক বাহিনী সমেত ৩০০-৪০০ জনের একটি মুসলমানের দল ওই জমি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় হিন্দুরা বাধা দিতে গেলে তাদের বাড়ি-ঘরে অবাধে ভাঙচুর, লুঠপাঠ চালানো হয়। মহিলাদেরও ছেড়ে কথা বলা হয়নি। প্রশাসনকে ডেকেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন। মুসলিম দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর জখম অবস্থায় গড়বেতা হাসপাতালে দু'জন মহিলাসহ প্রথমে ১০ জনকে ভর্তি করানো হয়। এঁরা হলেন—জগন্নাথ সর্দার, পাঁচু সর্দার, নাচু সর্দার, অসিত সর্দার, ভাস্কর সর্দার, শ্রীরাম সর্দার, অজিত সর্দার, অরিন্দম সর্দার, তারাপদ সর্দার, গীতা সর্দার ও যমুনা সর্দার। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জগন্নাথ ও নাচুকে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

শোক সংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক, প্রাইমারী শিক্ষক এবং ১২নং ওয়ার্ড বিজেপি-র সভাপতি সঞ্জীব পোদ্দার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন গত ৫ জুন বিকালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে গেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে সঙ্ঘ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

***

গত ৩০ মে সিউড়ী প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের কাছে মেজবৌদি নামে পরিচিতা, আর এস এসের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী অনিমা দাস সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তাঁর স্বামী অশ্বিনী দাস ৬ বছর আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দীপক দাস বিজেপি-র পৌরপিতা ছিলেন। সঙ্ঘের বহু বরিষ্ঠ প্রচারকই মেজবৌদির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

দাবীদারহীন মৃতদেহ কপালে ভাঁজ ফেলেছে নিরাপত্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০০৯ সালে ভারতের আটটি রাজ্য যথা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে দাবীদারহীন মৃতের সংখ্যা মোট ৩৪, ৯০২। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এঁদের। কিন্তু থাকলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান মিলল না কেন? এতজনের আত্মীয়ই নেই কিংবা মৃত ব্যক্তির প্রতি আত্মীয়রা উদাসীন—এমন ভাবার কোনও কারণ দেখছেন না তথ্যাভিজ্ঞ মহল। আর বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির যে হারে উন্নতি হয়েছে তাতে মৃতদেহ তাতে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৪৪৬ জন রয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে প্রতি বছরই গড়-পড়তা দাবীদারহীন মৃতদেহের সংখ্যা কিন্তু প্রায় কাছাকাছিই থাকছে। সুতরাং একটি চক্র (পড়ুন জঙ্গিগোষ্ঠী) পরিকল্পনা-মাফিক এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে চলছে কিনা তার অনুসন্ধান

দাবীদারহীন মৃতদেহ

বছর	অন্ধ্রপ্রদেশ	তামিলনাড়ু	উত্তরপ্রদেশ	বিহার	গুজরাট	কর্ণাটক	মহারাষ্ট্র	পশ্চিমবঙ্গ	সারাদেশে মোট
২০০৯	২৮৮৯	২৪৯১	৩২৯৭	১৪৮০	১৯০৯	২১০৭	৬৮৯৫	৪০১৭	৩৪,৯০২
২০০৮	৫৩৫৫	২৬৯৪	২১২৬	১০৭৪	১৯০৭	২১৫৫	৭৫৪৯	৫৫৬০	৩৭,৬৬৮
২০০৭	৪০৮৮	২২৩৭	৩৪৮২	১১১৫	২০৫৪	২৭৬৭	৭১০৭	৫৯৭৩	৩৭,২৮২
২০০৬	৫৪১৭	২০৪৫	৩৪৪৭	১৭৪৩	১৭৪৯	২৯১৩	৫৯৭৩	৪৯৩১	৩৬,১৩১
২০০৫	৬৪৬১	৫১২৫	৩৫৮০	১৯০২	১৬১৯	২৩৮৭	৬৮০০	৪৪১৮	৩৯,১৫৭
২০০৪	৩৯৪৪	২০৭১	৩৮০৪	১৩২৫	১১৮৮	২৬৭৩	৮,৪৯৭	৬,৭৭৮	৩৭,৩০৬
রাজ্যে মোট	২৮,১৫৪	১৬,৬৬৩	১৯,৭৩৬	৮,৬৩৯	১০,৪২৬	১৫,০০২	৪২,৮২১	৩১,৬৭৭	২,২২,৪৪৬

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই মৃতদেহগুলির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। অর্থাৎ এই মৃতদেহগুলোর কোনও দাবীদার নেই। সঙ্গতভাবেই তাই প্রশ্ন উঠছে—এঁরা কারা? এঁদের মৃত্যু-রহস্যটাই বা কি? মূল অপরাধী কারা? ইত্যাদি। পুলিশের কাছে চিহ্নিতহীন এইসব মৃতদেহের সন্ধান থাকলেও ওই প্রশ্নগুলির ব্যাপারে নিরুত্তর তাঁরাও। আর এখানেই সন্দেহটা দানা বাঁধছে যে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে ২০০৯-এ এই ৩৪,৯০২ জন মৃত ব্যক্তির সংখ্যাটা কোনও ফ্যাক্টর নয় তো? কারণ কেউ দীর্ঘদিন নিখোঁজ পুলিশি হেপাজতে, সেই মৃত ব্যক্তিটির আত্মীয়ও রয়েছে আর সেই আত্মীয়টি পুলিশি মর্গে মৃতের সন্ধান পাচ্ছেন না এমন ভাবাও দুষ্কর।

সুতরাং দেশজুড়ে চলা স্মাগলিং-এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই এই দাবীদারহীন মৃতদেহ তৈরি করেছে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন প্রশাসনিক মহল। আপাতত উপরোক্ত আটটি রাজ্য (এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও আছে) থেকে দু' বছরের (২০০৪-২০০৯) পর্যন্ত দাবীদারহীন মৃতদেহের যে তালিকা বিভিন্ন রাজ্য-পুলিশগুলোর হাতে এসেছে করছেন গোয়েন্দারা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রত্যেকটি দাবীদারহীন মৃতের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও তাদের ডেটা-বেস তৈরি না করতে পারলে সন্ত্রাসবাদীদের পুরো প্ল্যানটা জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু 'র‍্যানডাম সার্ভে' করেও আপাতত তদন্তের অগ্রগতি ঘটানো যেতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ ওই ২ লক্ষ ২২ হাজার ৪৪৬ জনের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান সহ বিস্তারিত পরিচয় বার করার মতো শক্তি ওই আটটি রাজ্যের পুলিশের নেই।

বাংলাদেশী সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রীর সরকারি বৈঠক

সংবাদদাতা: মালদা।। মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুজাপুর কেন্দ্র থেকে প্রয়াত এ বি এ গণিখানের ভাই আবু নাসের খান (লেবু) এবার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়ে তার বাংলাদেশী ভাগ্নি জামাইকে সঙ্গে নিয়ে মালদা সার্কিট হাউসে জেল প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত ৭ জুন সকালে মালদা সার্কিট হাউসে লেবুদার ওই বাংলাদেশি আত্মীয়কে সদর মহকুমা শাসক সমনজিৎ সেনগুপ্তের পাশে বসে থাকতে দেখে অনেকেই অবাক হন। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট না পাওয়ায় এই প্রতিমন্ত্রীর ভাগ্নি শাহনাজ কাদেরী এবার মোথাবাড়ি কেন্দ্র থেকে নির্দল হিসাবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জিততে পারেননি। তাঁর স্বামী বাংলাদেশী হয়ে কীভাবে একজন প্রতিমন্ত্রীর পাশে বসে থাকতে পারেন এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এতে কী বৈঠকের গোপনীয়তা নষ্ট হলো না? এ ব্যাপারে জেলা শাসক বলেন, বৈঠক যিনি ডেকেছেন সেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। লেবুদার ওই বাংলাদেশী আত্মীয় ইউসুফ কাদেরী বলেন, মামা ডাকাতে আমি এসেছি। এব্যাপারে প্রতিমন্ত্রী আবু নাসেরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, না আমি ডাকিনি, সে নিজেই এসেছে। একজন বাংলাদেশী নাগরিক এদেশের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থেকে অন্যায় করেছে, কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এত বিতর্ক হবে ভাবতে পারেনি। বাংলাদেশী ইউসুফ কাদেরী মন্ত্রীর আত্মীয় বলে তার কিছু হবে না অথচ বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। তাছাড়া সুজাপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত এবং অভিযোগ—এখানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকায় নাম তুলে ও রেশন কার্ড তৈরি করে ভারতের নাগরিক হিসেবে বসবাস করছে। এবারে বিধানসভা ভোটে প্রচুর নতুন ভোটার সংযোজন হয়েছে এই নির্বাচন ক্ষেত্রে। প্রশ্ন উঠেছে, এদেশের নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না? মন্ত্রী বলে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে? কে বলতে পারে সেই বাংলাদেশীর সঙ্গে আতঙ্কবাদীদের যোগাযোগ নেই?

মহাকরণে প্রেস কর্নার

প্রতিশ্রুতি রাখবেন তো মমতা ?

গূঢ়পুরুষের

কলম

সাম্প্রতিককালে অসংখ্য চ্যানেলের দৌলতে যেভাবে সাংবাদিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তাতে পুরানো স্থানে প্রেস কর্নার গড়ে লাভ নেই। স্থানাভাব হবে। তবে তাঁর প্রতিশ্রুতি মমতা কবে রাখবেন তা জানা যায়নি। সাংবাদিকরা কিন্তু আশায় বুক বেঁধে আছেন।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ক্ষমতায় ফিরলে তিনি মহাকরণে ১৯৫০ সালে ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের প্রেস কর্নার পুরানো স্থানেই আবার গড়ে দেবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কারণ তাঁকে কেন্দ্র করেই একটি ঘটনার পর বামফ্রন্ট সরকার প্রেস কর্নার ভেঙে দেন। নেমে আসে সাংবাদিকদের উপর বুদ্ধবাবু- জ্যোতিবাবুদের সরকারের দমন নীতি। যা' গত ১৩ মে তারিখে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ফল বেরুনো পর্যন্ত চলেছিল। সাংবাদিকরা অবশ্য থেমে থাকেননি। মহাকরণের সেই পুরানো স্থানেই দাঁড়িয়ে থেকে আজও তাঁরা নিয়মিত সাক্ষাৎকার নেন। টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা প্রতিদিন মহাকরণের যেসব প্রতিবেদন দেখেন সেই বিশেষ স্থানেই একদা ডা: রায়ের গড়া প্রেস কর্নারটি ছিল। এখন নেই। সেখানেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চিত্র সাংবাদিকরা ক্যামেরা বাগিয়ে অপেক্ষা করেন। প্রচণ্ড গরমে এইভাবে দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে কাজ করছেন মহাকরণের রিপোর্টার এবং চিত্রগ্রাহক সাংবাদিকরা। সে খবর ক'জন রাখেন। টিভির দর্শক বা সংবাদপত্রের পাঠকদের কথা বাদ দিন। তাঁদের জানার কথাই নয়। চ্যানেল বা খবরের কাগজের মালিক-পরিচালকরাই সেই খবর রাখেন না। রাখলে নিয়মিত টানা এতটা সময় ধরে এমন অমানবিক পরিবেশে কাজ করার জন্য 'শংসাপত্র' দিতেন। মনে রাখতে হবে মহাকরণের দোতলায় সাংবাদিকরা যেখানে অপেক্ষা করেন সেখানে তাঁদের পানের জন্য জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। দুপুরের প্রচণ্ড গরম এবং জলের অভাবে সাংবাদিকদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে খবর প্রচারিত বা প্রকাশিত হয় না। হ্যাঁ, এমনই অমানবিক পরিবেশে জ্যোতি-বুদ্ধরা সাংবাদিকদের কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। আজও তা চলছে একইভাবে। পরিবর্তন বা বদল হয়নি।

নির্বাচনের আগে মমতা অনেক জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর সেইসব প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টাও করছেন। সাংবাদিকদের দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিও ভোলেননি। বলেছেন, ঠিক সময়ে তিনি মহাকরণে নতুন প্রেস কর্নার গড়ে দেবেন। কিন্তু পুরানো স্থানে নয়। সাম্প্রতিককালে অসংখ্য চ্যানেলের দৌলতে যেভাবে সাংবাদিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তাতে পুরানো স্থানে প্রেস কর্নার গড়ে লাভ নেই। স্থানাভাব হবে। তবে তাঁর প্রতিশ্রুতি মমতা কবে রাখবেন তা জানা যায়নি। সাংবাদিকরা কিন্তু আশায় বুক বেঁধে আছেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে ১৯৯৩ সালের ৭ জানুয়ারির বিকেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকরণে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে ছিল নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের ধর্ষিতা গর্ভবতী বোবা কালা হত দরিদ্র তরুণী দীপালি। ধর্ষণকারী সিপিএম দলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা। ফলে পুলিশ মেয়েটির অভিযোগ নেয়নি। এরই প্রতিবাদে মমতা সদলবলে মহাকরণে জ্যোতিবাবুর কাছে নালিশ জানাতে এসেছিলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ছাড়াও পুলিশ বিভাগও দেখতেন। মমতা দক্ষিণ কলকাতা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে মমতা পদত্যাগ করলেও তাঁর পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও তখনও গ্রহণ করেননি। মমতা নিজে টেলিফোন করে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের সঙ্গে কথা বলে ৭ জানুয়ারি বিকেল ৩ টায় জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলেন। এই সত্যটি জ্যোতিবাবু-বুদ্ধবাবুরা পরে বেবাক অস্বীকার করেছিলেন। বরং প্রচার করেন যে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে মমতা সদলবলে এসেছিলেন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। এটি অসত্য কথা। যাইহোক, জ্যোতিবাবুতো দেখা করলেনই না। উল্টে পুলিশ ডেকে মমতা এবং তাঁর সঙ্গীদের নির্মমভাবে পিটিয়ে মহাকরণ থেকে বার করে দেওয়া হয়। মমতা সেই রাতেই প্রতিজ্ঞা করেন যতদিন এই রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় থাকবে ততদিন তিনি মহাকরণে প্রবেশ করবেন না। মমতা কথা রেখেছেন। সেই ঘটনার ১৮ বছর পর তিনি রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মহাকরণে প্রবেশ করেন। মমতাকে মহাকরণ থেকে সেদিন বার করে দেওয়ার পরেই বুদ্ধদেববাবুর নির্দেশে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিক এবং চিত্রাগ্রাহকদের উপর পুলিশ লাঠি চালায়। ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়। বিনা প্ররোচনায়। সাংবাদিকদের কেউ পুলিশের কাজে বাধা দেয়নি। চিত্রগ্রাহকরা সমস্ত ঘটনার ছবি তুলেছিলেন। সেই অপরাধে তাঁদের ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়। যথেচ্ছভাবে লাঠিপেটা করা হয়। হ্যাঁ, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি সেদিন মহাকরণে সাংবাদিকরা মার খেয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবুর নির্দেশেই আর সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন বুদ্ধভক্ত তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার গৌতম মোহন চক্রবর্তী এবং ডি সি সেন্ট্রাল অবনী জোয়ারদার। অবনীবাবু অবসর নেওয়ার পর বুদ্ধবাবুদের শিবির ত্যাগ করে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নেতৃত্বে আছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক হিসাবে বলছি, সেদিন অকারণে সাংবাদিকদের পুলিশ পিটিয়েছিল। এর একটা কারণ পরে মনে হয়েছিল যে সেই সময় সাংবাদিকরা জ্যোতিবাবুকে যতটা সমীহ করতেন তার এক শতাংশও বুদ্ধদেববাবুকে করতেন না। তাই সাংবাদিকদের দেখানোর প্রয়োজন ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কতটা ক্ষমতাবান। ঘটনার পরের দিন মহাকরণের প্রেস কর্নারটি বুদ্ধদেববাবুর নির্দেশেই ভেঙে দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকদের মহাকরণে প্রবেশাধিকার দেওয়ার সরকারি পরিচয় পত্রগুলি সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন শুরু হয়। সে এক অন্য ইতিহাস। অন্যত্র বলা যাবে।

সিপিএমের অস্ত্রাগার উদ্ধার

গুম-হত্যার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে

নিশাকর সোম

রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী বলেছিলেন, ''এত রক্ত কেন?'' আজ পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার নন্দিনী এবং নন্দন বলেছে, ''এত অস্ত্র কোথায় ছিল? কেন ছিল? কি জন্য ছিল?'' কেন মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল বেরোয়? ৮ম বামফ্রন্ট এলে আবার এসব ঘটনা ঘটতো না তো? সিপিএম পার্টি সম্পর্কে বহু কথাই এই কলামে লেখা হয়েছে যার প্রতিধ্বনি সিপিএম পার্টিতে এমনকী বামফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমরা বলতে চাই যেখানে যার হেফাজতে থাক, অস্ত্র উদ্ধার চালানোর ব্যাপারে রঙ দেখার দরকার নেই। মানুষের ধিক্কার তো ভোটের মধ্যে জানানো হয়েছে। সিপিএমের অস্ত্র-কঙ্কাল ঘটনায় সসেমিরা অবস্থা। ''বন্দুকের নলই শক্তির উৎস''---এই বাক্যটাই গ্রহণ করেছিল সিপিএম-নেতৃত্ব। পার্টিকর্মীদের ভাড়াটে সৈনিকে পরিণত করেছিল। নিচের কমরেডরা মার খাবেন, আর নেতৃত্বের ধ্বংস কামনা করবে। ভুজঙ্গ ছেড়েছে খোলস, গরুড় হয় সাবধান। হায়দরাবাদে আগামী কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোর সভায় সর্বজন নিন্দিত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাওয়ার কথা ছিল। এই যাওয়ার কারণটা খুবই স্পষ্ট। তাঁর ফেভারিট তত্ত্ব ''ইউপিএ থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার ফলেই এই বিপর্যয়''। তিনি সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে জোট করে কারাতের বিরুদ্ধে লবি সৃষ্টি করতে চাইছেন। তা হবার নয়। সিপিএমের পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-গৌতম-বিনয়-এর কোনও কথাই টিঁকবে না। কারণ নিজেদের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা ব্যর্থ হবে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো-তে তীব্র সমালোচনা উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে পার্টি নেতৃত্ব তথা মন্ত্রিসভা পরিচালনার বিষয় নিয়ে।

শুধু পার্টির মধ্যেই নয়, বামফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যেও বুদ্ধ-বিনয়- নিরুপম-বিমান-গৌতম দেব-বিনয় কোঙার-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উঠেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছেন যে বামফ্রন্টের নেতৃত্ব অর্থাৎ চেয়ারম্যান বদলাতে হবে। ফরওয়ার্ড ব্লকের চলে যাওয়া নেতা জয়ন্ত রায় ফিরে এসেছেন। ওদিকে নরেন চ্যাটার্জি পার্টি ছাড়ার কথা জানিয়েছেন। নরেনবাবুর নেতৃত্বে একগুচ্ছ ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী তৃণমূলে যোগ দেবার পরিকল্পনা করছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা সিপিএমের জন্য আমাদের এই দুর্দশা। সিপিএম কার্যত বামফ্রন্টে একা। কারণ ভোটের কিছু আগেই একটা খবর ছড়িয়ে ছিল যে, ক্ষিতি গোস্বামী-এর নেতৃত্বে আর এস পি তৃণমূলে যোগ দিতে পারে। এখন তো মমতা ব্যানার্জি ক্ষিতি গোস্বামীর স্ত্রী-কে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন করেছেন। শোনা যাচ্ছে, আর এস পি বামফ্রন্ট ত্যাগ করার জন্য এক পা বাড়িয়ে আছে। আর এস পি-তে আর তেমন 'বামপন্থীর মোহ' নেই। আর এস পি-এর শ্রমিক নেতা দিনের পর দিন একটি নব-শিশু বাংলা

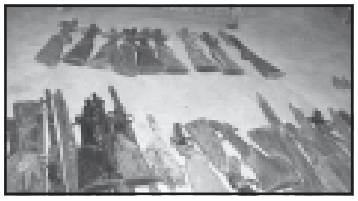

দৈনিকে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন, যদিও তিনি একসময়ে সল্টলেক পৌরসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রয়াত দিলীপ গুপ্তের তদানীন্তন কথায় এবং তাঁর দলের সাহায্যে। আর এস পি বামফ্রন্টে থেকে মৌলালির নিকটে লেনিন সরণীতে বহু ভাড়াটে সহ প্রায় কোটি টাকার বাড়ি সম্পত্তি করেছে। রিপন স্ট্রীটের ক্রান্তি প্রেস—বাড়িটার সম্পত্তির মালিক আর এস পি। তবে শুধু আর এস পি নয়, বামফ্রন্টের সব পার্টিই 'গুছাইত' হয়েছেন, আর সিপিএম তো জমিদারি তৈরি করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক-এরও কোটি টাকার সম্পত্তি। সিপিআই-এর ভূপেশ ভবন তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্ট্রোল অফ ভ্যাগারেন্সি-এর বাড়িটা প্রায় নামমাত্র মূল্যে জ্যোতি বসু দিয়েছিলেন। এহেন অবস্থায় সিপিআইও বামফ্রন্টের নেতৃত্বে বদল চাইছে। সিপিআই-এর রাজ্য-কমিটির সভায় সকল সদস্যই বলেছেন, সিপিএমের এর দাদাগিরি মানার জন্য বামফ্রন্টের দরকার নেই। এই কলামে বহু আগেই লেখা হয়ে গেছে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে অশোক ঘোষ এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে সিপিএম-সিপিআই থাকুক। সিপিএম যতই চেষ্টা করুক না কেন, বামফ্রন্ট আর থাকবে না। কিরণময় নন্দের দল থমকে দাঁড়িয়েছে, কারণ কিরণময় নন্দের নেতা মুলায়ম সিং যাদব এখন দিশা ঠিক করতে পারেননি। রামদেব-কে নিয়ে যে কাণ্ড কেন্দ্রীয় সরকার করেছে তাতে হিন্দী বলয়ে কংগ্রেসের শোচনীয় অবস্থাতে মুলায়ম ভাবতে শুরু করেছেন?

রামদেব-এর অনশন মঞ্চে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে এরাজ্যের মানবাধিকার-এর অছিরা এবং বিদ্বজ্জনেরা নীরব কেন? এরাজ্যের তথাকথিত প্রতিবাদী দৈনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা ন্যক্কারজনক--- কেউ লিখ্লো—'ভাগলবা', কেউ লিখলো—'মেয়ে সেজে পালিয়ে গেল।' ধিক! সেদিন দিল্লিতে আর একটা জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষের মানুষকে প্রতিবাদ করতে হবে। একথা জোর দিয়ে বলা যায় প্রশ্নটা রামদেব নয়, প্রশ্নটা অনশনরতদের উপর অত্যাচার। ওদিকে যদি মুসলিম ধর্মের লোকেদের উপর যখন সামান্য অত্যাচার হয়েছিল তখন গেল গেল রব উঠেছিল। যখন হিন্দুদের নগ্ন চিত্র অঙ্কনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল, তখন আওয়াজ ওঠে 'শিল্পীর স্বাধীনতা'! এর পেছনে তথাকথিত বিদ্বজ্জন সরব হোন। আর হিন্দু প্রতিবাদীদের উপর অত্যাচার-এ নির্বাক। মনে পড়ে যাচ্ছে আর এস এস-কে বেআইনী করা, জরুরি অবস্থার সমর্থনে তদানীন্তন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া সমর্থন করে লিখেছিলেন। তবে দিল্লির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিপিএমের পলিটব্যুরো প্রতিবাদ জানিয়েছে। দেখা যাক লোকসভায় কোন দল কোথায় থাকে?

ষড়যন্ত্রের প্রমাণ

গত ১০ জুন পাক-মাটিতে পদার্পণ করলেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ প্রধান লিওন পানেট্টা। উদ্দেশ্য একটাই---ইসলামাবাদের হাতে জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে পাকিস্তানের সরকারি আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ তুলে দেওয়া। আর এটা করতে গিয়েই তিনি ভিডিও ক্লিপিংসের প্রমাণ সহযোগে মুখোমুখি হলেন এমন দুই সর্বোচ্চ পাক-আধিকারিকের যাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সন্ত্রাসবাদীদের নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতার অভিযোগ এখন সংশয়তীতভাবেই প্রমাণিত। বলা বাহুল্য, সেই দুই ব্যক্তি হলেন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আশফাক পারভেজ কিয়ানি এবং আই এস আই প্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল আহমেদ সুজা পাশা। প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই উঠছে, ষড়যন্ত্রের প্রমাণ ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তুলে দিয়ে ষড়যন্ত্রের পথই প্রশস্ত করে গেলেন না তো পানেট্টা।

মাও-সন্ত্রাস

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী সন্ত্রাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দু'দিনে রাজ্যে উপর্যুপরি তিনি তিনবার আক্রমণ হানল তারা। গত ১০ জুন দান্তেওয়াড়া জেলার কোটনা ব্লকে নকশাল অধ্যুষিত ভেজ্জি গ্রামে হানা দিয়ে তিনজন সি আর পি এফ জওয়ানকে হত্যা করে এবং আরও তিনজন আহত হন। ইতিপূর্বে ৯ জুলাই মধ্যরাত্রে দান্তেওয়াড়াতেই মাওবাদীদের পোঁতা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ১০ পুলিশকর্মী মারা যান। ওইদিন সকালে বস্তার জেলার নারায়ণপুরে রক্ষীবাহিনীর পাঁচজন সশস্ত্র সদস্যকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে মাওবাদীরা। লক্ষণীয় বিগত কয়েকমাস ধরে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীরা যে সশস্ত্র হানা চালাচ্ছে তার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সরকারি নিরাপত্তারক্ষীরাই। অথচ এনিয়ে যেটুকু দায় দৃশ্যমান হচ্ছে তা কেবল রাজ্যের, কেন্দ্র হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।

দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে

ইউ পি এ সরকারের আর্থিক জালিয়াতির বিরুদ্ধে বড়সড় আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা নিল বিজেপি। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ২৩ থেকে ২৬ জুনের মধ্যে অন্তত একশোটি স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করবেন বিজেপি-কর্মীরা। মূলত তিনটি দাবীকে সামনে রেখে তাঁরা আন্দোলনে নামছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। দাবীগুলির মধ্যে দুটি দাবী বহুশ্রুত, যথা—দুর্নীতি দূরীকরণ ও কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা। তবে এনিয়ে তৃতীয় দাবীটি অভিনব ও নতুন, যেজন্য মাথার চুল ছেঁড়ার উপক্রম হয়েছে 'টিভি কংগ্রেসী'দের (যাদের মধ্যে অগ্রণী দিগ্বিজয় সিং, মনীশ তেওয়ারী, জয়ন্তী নটরাজন প্রমুখ)। এই তৃতীয় দাবীটি হলো গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা।

অন্ধ্র নিয়ে বিপাকে

তাঁরা এসেছিলেন তেলেঙ্গানা রাজ্য-গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে। তাঁরা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রের সরকার আমাদেরই, তাই তেলেঙ্গানা হচ্ছেই। একবার নয়, অন্ধ্রের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের আগে এভাবেই পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য-গঠনের প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে ওই বিশেষ এলাকা ভুক্ত অঞ্চলে জয়লাভ করে এসেছেন 'তাঁরা' অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেসী বিধায়ক-সাংসদেরা। সেকারণেই তেলাঙ্গানা রাজ্য-গঠনের জন্য ক্রমেই জনগণের চাপ বাড়ছিল তাদের ওপর। সেই চাপ বর্তমানে এতটাই অসহ্য হয়ে উঠেছে যে গত ৯ জুন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্ধ্র-কংগ্রেসের সেই বিধায়ক-সাংসদেরা একপ্রকার 'আল্টিমেটাম' দিয়ে দিয়েছেন যে অবিলম্বে 'তেলেঙ্গানা' রাজ্য গঠিত না হলে পদত্যাগ করবেন তাঁরা।

শুদ্ধ বানান

বিশুদ্ধ বানান সমেত একটা প্রবন্ধ কেন একটা পংক্তি কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সারি (লাইন) লেখাও এই পবিত্র সরকার উত্তরযুগে একপ্রকার অসম্ভব। তবে বাংলা বানানের বারোটা সরকারমশাই আর তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডারা (পড়ুন বামফ্রন্ট সরকার) বাজিয়ে ফেললেও ইংরেজিতে বোধহয় দাঁত ফোটাতে পারেননি। নইলে আমেরিকার স্পেলিং বি কনটেস্টে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুকন্যা রায় সেরা হন কি করে? বাঙালি পেরেছেন, বাংলা (ভাষা) পারবে না?

কর্ণাটকে রাজ্যপালের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

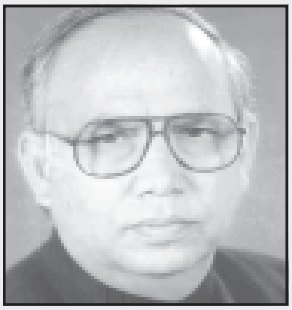

হংসরাজ ভরদ্বাজ

রাজ্যপাল ভরদ্বাজ এই সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। সরকারের আগেকার সঙ্কটের সময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সরানোর জন্য রাষ্ট্রপতি-শাসন জারীর সুপারিশ করেছিলেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সেটা তখন গ্রহণ করেনি। এবারও তিনি একই ধরনের সুপারিশ করেছেন এবং সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ইয়েদুরাপ্পা

সম্প্রতি কর্ণাটকের রাজ্যপাল হংসরাজ ভরদ্বাজ তাঁর এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। দক্ষিণের একমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকের রাজনীতিকে তিনি যেন অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে চান। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা গত তিন বছরে বার দুয়েক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন—রাজ্যপাল মনে হয় এই সুযোগটাইকেই কাজে লাগিয়ে বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চান। নিরপেক্ষ রাজ্যপালের ভূমিকা পালন না করে তিনি চাইছেন রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন।

২০১০ সালের অক্টোবরে বিজেপি-র ১১ জন ক্ষুব্ধ বিধায়ক ও ৫ জন নির্দল বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে তাঁর ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন। বিষয়টা একটা সাংবিধানিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল এবং সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সাময়িকভাবে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের পদচ্যুতিও ঘটেছিল তখন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিক্ষুব্ধ বিধায়করা সদস্যপদ ফিরে পেয়েছেন আদালতের রায়ে।

তাৎপর্যের বিষয় হলো—বিজেপি-র শীর্ষ নেতাদের চেষ্টায় সাময়িকভাবে বিক্ষুব্ধরা আবার সরকারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তার ফলে ইয়েদুরাপ্পার সঙ্কট পুরোপুরি কেটে গেছে। ২২৪ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বিজেপি-র দলীয় সমর্থকদের সংখ্যা এখন ১১৯ এবং নির্দল সঙ্গীদের নিয়ে ১২১ (দরকার ১১৩ জনের সমর্থন)। এই কারণে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি যে কোনও সময় গরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে রাজী। তাঁর আরেকটা সুবিধে হলো—সম্প্রতি উপ-নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

কিন্তু মুস্কিল হল—রাজ্যপাল ভরদ্বাজ এই সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। সরকারের আগেকার সঙ্কটের সময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সরানোর জন্য রাষ্ট্রপতি-শাসন জারীর সুপারিশ করেছিলেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সেটা তখন গ্রহণ করেনি। এবারও তিনি একই ধরনের সুপারিশ করেছেন এবং সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত বিধায়করা সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার এবং মত পরিবর্তন করে সরকারের পেছনে এসে দাঁড়ানোয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্কট কেটে গেছে। তাঁদের বিবৃতির ভিত্তিতেই বোঝা যাচ্ছে যে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর গরিষ্ঠতা এখনও রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে—রাজ্যপাল ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি-শাসন চাইছেন কেন? এটা সংবিধানের আদর্শকে হত্যার প্রয়াস নয়?

সদস্যদের দল-বদল বা শরিকদলের বিদ্রোহের ফলে একটা ক্যাবিনেটের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিতেই পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে গরিষ্ঠতা যাচাইয়ের জন্য বিধানসভার মুখোমুখি হওয়ার জন্য রাজ্যপাল তাঁর মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করতেই পারেন। এটা লক্ষণীয় যে, মুখ্যমন্ত্রী যে কোনওদিন বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা দিতে রাজী আছেন বলে অনেক আগেই জানিয়েছে। তাহলে রাজ্যপাল ১৭৪ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধানসভা না ভেঙে হঠাৎ রাষ্ট্রপতি-শাসন জারী করতে চাইলেন কী কারণে?

মনে পড়ছে—১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলার অজয় মুখার্জীর সরকার থেকে ১৭ জন বিধায়ক সরে যাওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে সরকারের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। রাজ্যপাল ধর্মবীর কিন্তু সরকার ভেঙে না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন বিধানসভায় তাঁর গরিষ্ঠতা দেখানোর জন্য, কারণ বিধানসভাই গরিষ্ঠতা নির্ণয়ের একমাত্র স্থান।

রাজ্যপাল দুবার এই অনুরোধ করার পরেও মুখ্যমন্ত্রী রাজী হননি—তিনি চেয়েছিলেন দীর্ঘ সময় যাতে 'হর্স-ট্রেডিং' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেরামতের কাজটা করা যায়। সেই অবস্থাতে রাজ্যপাল তাঁর মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে নতুন সরকার তৈরি করেছিলেন। বলা বাহুল্য, কলকাতা হাইকোর্ট এই ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ সংবিধান-সম্মত

বলে রায় দিয়েছিল—(শর্মা বনাম ঘোষ, ১৯৬৭)।

কিন্তু ইয়েদুরাপ্পা যে কোনও সময় বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা দিতে রাজী বলে জানিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতাবলেই বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে পারতেন আর তাতে মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হলে তাঁকে বিদায় নিতেই হোত। কিন্তু কেন রাজ্যপাল হঠাৎ রাষ্ট্রপতি-শাসনের সুপারিশ করলেন, সেটা আমাদের বোধগম্য হলো না। ডঃ এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'He is expected to be strictly neutral in state-politics and to transcend his individual peaning and failings'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ: ২৩০)।

সেই আদর্শ কি রাজ্যপাল ভরদ্বাজ রক্ষা করতে পেরেছেন?

জি এস পান্ডে লিখেছেন, 'A ministry, which has lost confidence of the legislature way also being to the office and may not advice the summoning of the legislature to test its strength'—এই অবস্থায় অবশ্যই রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করতে পারেন (কনস্টিটিউশনাল ল অফ ইন্ডিয়া, পৃ: ২৪০)। কিন্তু ইয়েদুরাপ্পা-সরকার বিধানসভায় পরাজিত হয়নি, শক্তি পরীক্ষায় গররাজির কথাও জানাননি। তাহলে কোন্ যুক্তিতে তাঁর পতন ঘটাতে হবে? ড: অনুপচাঁদ কাপুরের মতে, মুখ্যমন্ত্রী যদি

ইয়েদুরাপ্পা যে কোনও সময় বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা দিতে রাজী বলে জানিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতাবলেই বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে পারতেন আর তাতে মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হলে তাঁকে বিদায় নিতেই হোত। কিন্তু কেন রাজ্যপাল হঠাৎ রাষ্ট্রপতি-শাসনের সুপারিশ করলেন, সেটা আমাদের বোধগম্য হলো না।

পরাজয়ের ভয়ে পালিয়ে থাকতে চান এবং শক্তি-পরীক্ষায় অসম্মত হন, তবেই রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করতে পারেন---(দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সীস্টেম, পৃ: ৩৫৫)। কর্ণাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অসহযোগিতা দেখা যায়নি। তাঁর গরিষ্ঠতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে বিধানসভায় শক্তি-পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলা হলো না কেন?

ড: মধুমঙ্গল সিংয়ের মতে, রাজ্যপালকে তাঁর সততা, নিরপেক্ষতা ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতেই হবে—(দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, পৃ: ৩১০)। কিন্তু কোন কোন রাজ্যপাল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের স্বার্থে সেই আদর্শ লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য কংগ্রেসের লক্ষ এখন একটাই—ড: জে সি জোহারীর ভাষায়—'to regain the lost paradise of power' (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ: ৮৯০)। সেক্ষেত্রে এই ধরনের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনীতিতে নোংরা খেলা খেলতেই পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্যপালের পরামর্শ মেনে নেয়, তাহলে তার উগ্র ক্ষমতা- লিপ্সার দিকটা স্পষ্ট হয়ে যাবেই।

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ সোলী সোরাবজী মন্তব্য করেছেন, রাজ্যপাল বিরোধী নেতার মতোই আচরণ করেছেন। রাজীন্দর পুরীও জানিয়েছেন, 'The Governor is grossly violating the spirit of the constitution'—(দ্য স্টেট্স্ম্যান, ১৭.৫.১১)। এটা অবশ্যই নিন্দনীয় ব্যাপার।

ভারত যেন একটা হট্টগোলমুখর বিয়েবাড়ি

অতিথি কলম

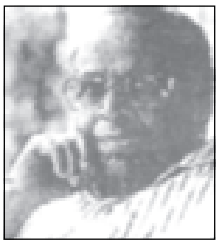

ডঃ জয় দুবাসী

আমি এক সপ্তাহ কর্ণাটকের একটি বিয়ে বাড়িতে কাটিয়ে এলাম। হিন্দুদের বিয়ের ব্যাপারটা অদ্ভুত। দিনের পর দিন ধরে বিয়ের উৎসব চলে। ঘরের এক কোণে বসে দেখবে তোমার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো মাসতুতো ভায়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের আপনি হয়তো বহু বছর দেখেননি। তাছাড়া চারিদিকে এমন হৈ-চৈ হচ্ছে যে তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে কখন 'মুহূর্তম' আসবে যখন বর-বধূ মালা বদল করবে।

ভারত যেন এমনই একটা বিয়ে বাড়ি। এখানে সবকিছু হৈ চৈ-তে ভর্তি। তবু সব যেন কেমন ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়। এই ভারতীয় সমাজ যেন একটা পুরনো ইঞ্জিনের মত অভ্যাসবশত চলেছে। চলেছে বিনা চেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

এবং তারপর সবাই বিদায় নেবে।

ভারত যেন এমনই একটা বিয়ে বাড়ি। এখানে সবকিছু হৈ চৈ-তে ভর্তি। তবু সব যেন কেমন ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়। এই ভারতীয় সমাজ যেন একটা পুরনো ইঞ্জিনের মতো অভ্যাসবশত চলেছে। চলেছে বিনা চেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

বিগত কয়েক মাস ধরে ভারতে একটা অচলাবস্থা চলছে। সংসদ এবং সরকার সবই অচল। মনে হবে দেশের সবকিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হবে। কিন্তু তা হয়নি। ট্রেন চলেছে সময় মতো। কলকারখানা বন্ধ হয়নি। অফিসে কাজ হয়েছে আগের মতো। ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স পেয়েছে যথা সময়ে। শিশুরা গিয়েছে স্কুলে। পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে। রাজনৈতিক কর্মী এবং বাবুরা ঘুষ নিয়েছে। এয়ারপোর্ট ও রেলস্টেশন কর্মব্যস্ত ছিল। হয়তো সর্বত্র এলোমেলো ভাব কিন্তু কোনও কিছু স্তব্ধ হয়নি তো।

আমি পৃথিবীকে তিনটে ভাগে ভাগ করবো—বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে কাজ হওয়া দেশ (যেমন ভারত)। বিশৃঙ্খলার জন্য অচলাবস্থা (যেমন পাকিস্তান ও অন্যান্য অনেক মুসলিম রাষ্ট্র)। এবং সুশৃঙ্খল দেশ (যেমন পশ্চিমীদেশ)।

কখনও কখনও অবাক লাগে আমাদের বিশৃঙ্খলা দেখে। মুম্বাইয়ের মতো সুশৃঙ্খল শহরে রোড ক্রসিংয়ের সময় দেখা যাবে এই বিশৃঙ্খলা। হতভাগ্য ট্রাফিক পুলিশ কি কষ্ট করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে। সময়ে সময়ে মনে হবে সে বুঝি বাস-চাপা পড়বে। কিন্তু তা হয় না। পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে দিল, অমনি সব গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ। তারপর আবার ম্যাজিকের মতো সব চলতে লাগল। আবার বিশৃঙ্খলা, হৈ চৈ যতক্ষণ না আবার বাঁশি বাজিয়ে পুলিশ গাড়ি থামান।

পশ্চিমে সব কিছু সুশৃঙ্খল। এবং জনতা যেন শিক্ষিত কুকুরের মতো। ট্রাফিক পুলিশ যা নির্দেশ দেয় তারা ঠিক তাই করে। নীরবে মেনে চলে ট্রাফিক সিগন্যাল। কেউ ট্রাফিক নির্দেশ অমান্য করে না, শিশুরাও না। আমি টোকিওতে হোটেলের দশম তলায় এক সময় ছিলাম। তখন মধ্যরাত্রে দেখলাম রাস্তাঘাটে খুব ভিড় নেই। কিছু মাতাল রাস্তায়। হঠাৎ এই সামান্য কজন মানুষ থেমে গেল চকিতে যেই লাল আলো জ্বলে উঠল। এমন শৃঙ্খলা কি ভারতে ভাবা যায়?

লন্ডনে ভূতলট্রেনগুলি সবসময় ভীড়ে ভর্তি। ট্রেনের কামরায় ঢুকতে বা বেরোতে তোমাকে ঠেলতে হবেই। এমন অবস্থা মুম্বইতে হলে তোমার ফাউনটেন পেন অথবা ঘড়ি বেশির ভাগ সময়ে খোয়া যাবে। কিন্তু লন্ডনে তা হবেই না। সেখানে মানুষ এত ভদ্র যে ধাক্কাধাক্কি হলেও মনে হবে না তোমার ধাক্কা লেগেছে। এমন কি যুবতীরা তোমাক কাছে ক্ষমা চাইবে যদি ধাক্কা লাগে। বৃদ্ধবৃদ্ধারাও তোমাকে আগে যেতে দেবার জন্য এক পাশে সরে দাঁড়াবে। সেখানে সবকিছু সুশৃঙ্খল, সবকিছু শান্তিপূর্ণ।

আমরা ভারতবাসীরা শৃঙ্খলা পছন্দ করি না। হয়তো এর একটা কারণ হলো প্রভুত্ব বরদাস্ত করা আমাদের ধাতে নেই। এবং প্রভুত্ব বরদাস্ত না করাটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন— এবং ভীষণভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমার বিশ্বাস এর জন্য তাঁকে বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। ভারতীয়দের স্বভাবে রয়েছে কিছু না মানার মানসিকতা। এটা হিন্দুচরিত্রের একটি লক্ষণ। আমরা স্বভাবতই বিদ্রোহী কারো কোনওরকম প্রভুত্ব আমরা পছন্দ করি না। এক হাজার বছর ধরে আমরা আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। এবং ভীষণভাবে তাদের পর্যুদস্ত করেছি।

ঔরঙ্গজেব যিনি মোগল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য, তিনি শিবাজীর হাতে এমন নাজেহাল হয়েছিলেন যে একবার বলেই ফেলেছিলেন যে তিনি এমন কি করেছেন যে এমন সাজা পাচ্ছেন! এক সময় তিনি স্বীকারও করেছিলেন যে অন্যপক্ষ নয় তিনিই নিপীড়িত হয়েছেন। তিনি শেষপর্যন্ত মারাঠা রাজ্যে মারা গিয়েছিলেন এবং মারা যাবার পর নিজেকে সবচেয়ে সুখী মানুষ ভেবেছিলেন মনে হয়।

ইংরেজরা যখন ভারত ত্যাগ করে গিয়েছিল—বলা ভালো বাধ্য হয়েছিল ভারত ত্যাগ করতে—তারা মনে কষ্ট পেয়েছিল। কিছু ইংরেজ ভারতকে ভালোবেসেছিলেন কিন্তু তাঁরা আমাদের কখনও বোঝেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন ভারতে শান্তি-শৃঙ্খলা আনার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু তাঁদের বোধগম্য হয়নি যে আমরা হিন্দুরা বিদেশীদের আমাদের উপর চাপানো শৃঙ্খলা পছন্দ করি না। মোদ্দা কথা হলো আপাতদৃষ্টিতে আমরা শৃঙ্খলাহীন হলেও আমাদের একটা নৈতিক শৃঙ্খলা আছে যা আমাদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে রাখে। কি সাংস্কৃতিক কি আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের সমাজ শৃঙ্খলার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে—যদিও বাইরে থেকে ঠিক উল্টোটাই মনে হবে। এবং অভ্যন্তরীণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা থাকার জন্য আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে আছি এবং আগামীদিনেও থাকব।

অতএব আমরা শৃঙ্খলাপরায়ণ হব। কিন্তু বেশী বেশী শৃঙ্খলাপরায়ণ নয়, নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি নয়। ভারতের অজস্র শত্রু আছে। এবং আমাদের তাদের জয় করতে হবে। অতিরিক্ত শৃঙ্খলা তোমাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধবে। জার্মানদের কথাই ধরো অতিরিক্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার জন্য—এবং এটাই হিটলারের বিশ্বাস ছিল—তারা ধ্বংস হয়ে গেল। মোট কথা আমাদের অতিরিক্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার দরকার নেই।

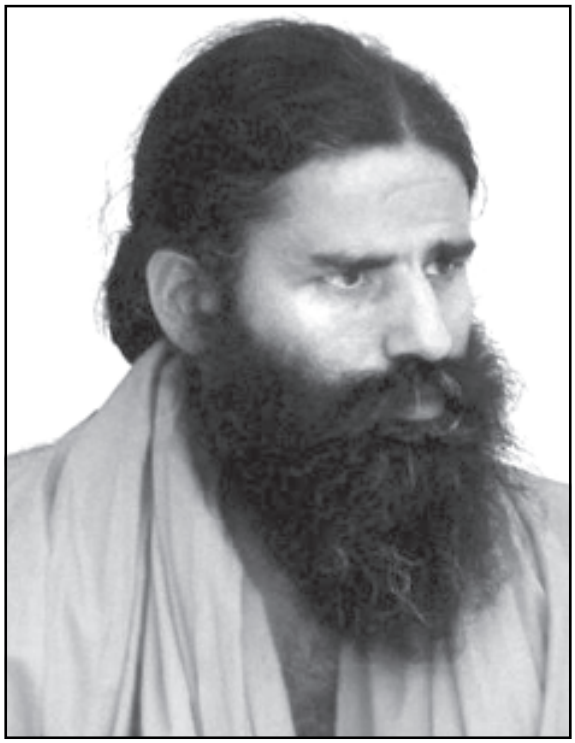

বাবা রামদেবের ওপর সরকারি হামলা

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

যারা ধর্ম গোপন করে দেশ শাসন করছে, সেই বিধর্মীদের হাতে সনাতন ভারতের সাধু-সন্তরা আক্রান্ত। ৪ জুন শনিবার মধ্যরাতে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে যোগগুরু রামদেব ও তাঁর শিষ্য- অনুরাগীদের উপর সোনিয়া গান্ধী ও তার পুত্র রাহুল গান্ধীর (যিনি নাকি হবু প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী!) নির্দেশে হাজার হাজার পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্দয়ভাবে নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে রামলীলা ময়দানে সমবেত প্রায় লাখ খানেক পুরুষ-নারী-শিশুকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। সভামঞ্চ ভেঙে চুরমার করেছে, সত্যাগ্রহীদের মাথার উপরের ছাউনি আগুনে ছাই করেছে। রামদেবজীকে চ্যাংদোলা করে দিল্লী থেকে হরিদ্বারে পাচার করেছে।

এই বর্বরতার সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগে ও অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে পুলিশ মিলিটারির নির্মম অত্যাচার ও বর্বোরোচিত তাণ্ডবলীলার সঙ্গে। ইটালি থেকে 'ট্রোজান হর্স' রূপে আনীত রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এই শ্বেতাঙ্গিনীর চোখে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি, দেবদেবী, সাধুসন্ত সবই চক্ষুঃশূল। যারাই এদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই এরা ধরাপৃষ্ঠ হতে লোপাট করে দিয়েছে নতুবা পিটিয়ে জন্মের মতো পঙ্গু করে ঘরে ঢুকিয়েছে। তা না হলে রামলীলা ময়দানে নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর গ্রে-হাউন্ডের মতো পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার কি প্রয়োজন ছিল?

যোগগুরু রামদেব কি অপরাধ করেছেন? দেশের মানুষের হাড় মাস রক্ত চুষে চিবিয়ে যারা বিদেশের ব্যাঙ্কে কালো টাকার পাহাড় গড়েছে, সেই টাকা উদ্ধার করে আনা এবং কালো টাকার কারবারীদের নাম প্রকাশ ও যথার্থ শাস্তিদান এবং উদ্ধারকৃত অর্থ দেশে এনে জন হিতার্থে ব্যয় করার দাবি জানিয়ে তিনি অনশনে বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সহমর্মিতা দেখাতে হাজারে হাজারে নরনারী শিশুও সামিল হয়েছিল। কিন্তু রামদেব, রামলীলা, রামমন্দির, রামনামেই কংগ্রেসী শাসকদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। কালো টাকার কালো হাত যে ১০নং জনপথ পর্যন্ত প্রসারিত। অপরাধীগণ আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে। পাছে বিলম্বে আরও কোনও গুপ্ত কর্ম সুপ্তোত্থিত কেউটের মতো ফোঁস করে ওঠে, তাই জনমত এই দিল্লীকা ঠগদের বিরুদ্ধে প্রবল হবার আগেই ছোবল মেরে বসেছে। এই সরকারের 'ডাল মে কুছ কালা' নয়, সব ডালই কালা।

তাই কালো টাকা উদ্ধারের দাবি ঠেকাতে কালাকানুন প্রয়োগেও এদের কোনও দ্বিধা নেই।

পৌরাণিক যুগে রাজা বা রাজ্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হলে রাজ্যস্থ মুনি-ঋষিরা রাজার সমর্থনে এগিয়ে আসতেন। রাজা সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের হিতোপদেশ গ্রহণ করতেন। নিজেকে শোধরাতেন কিংবা রাজ্যকে বিপদমুক্ত করে প্রজাদের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতেন। আর এখনকার শাসকগণের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা হিতোপদেশ শোনা তো দূরের কথা বরং হিতোপদেশের গল্পের মূর্খদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উপদেশ প্রদানকারীর আশ্রয়স্থল ভেঙে চুরমার করে নিজেদের দম্ভ ও ক্ষমতা জাহির করে। আমআদমীর মুখোশধারী এসব ভ্রষ্টাচারী শাসককুল আম খেয়ে আদমীদের দিকে আঁটি নিক্ষেপ করতেই অভ্যস্ত।

বাবা রামদেবের মূল দাবী

- **কালো টাকার পুনরুদ্ধার**---অবিলম্বে বিদেশে সঞ্চিত ভারতীয়দের ৪০০ লক্ষ কোটি টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সেই অর্থকে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।
- দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের ফাঁসি দিতে হবে।
- ১০০, ৫০০ বা ১০০০ টাকার নোটের মতো উচ্চ-কারেন্সীযুক্ত সমস্ত নোট বাতিল করতে হবে যাতে আর্থিক জালিয়াতি'র ন্যূনতম সুবিধাটুকুও দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও ব্যক্তি নিতে না পারেন।
- **শক্তিশালী লোকপাল বিল**—২০১১-এর আগস্টের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধকারী পাকাপোক্ত ও কার্যকরী জন লোকপাল বিল চালু করতে হবে।
- অবিলম্বে ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইনস্ট কোরাপশান (ইউ এন সি এ সি বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলন)-এ সাক্ষর এবং তা বলবৎ করতে হবে।
- গণতান্ত্রিক ভারতে 'বৃটিশ শাসন'-এর অবসান ঘটাতে হবে—দেশের প্রত্যেকটি অংশ থেকে ইংরেজ (বৃটিশ) কেন্দ্রিক পদ্ধতি (সিস্টেম) পাল্টাতে হবে।
- **নির্বাচন পুনর্গঠন**—প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই দেশের জনগণের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে হবে।
- প্রত্যেক রাজনীতিক বা নির্বাচনের প্রার্থী বার্ষিকভাবে তাঁদের রোজগার জানাতে বাধ্য থাকবেন, শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়ই তা জানালে চলবে না।
- আয়কর সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটিকে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

কথায় বলে দরবারে না পেয়ে ঠাঁই : ঘরে এসে স্ত্রী কিলাই। এই শাসক-শাসিকারা মুসলমান সন্ত্রাসীদের দমন করতে পারে না, পারে শুধু নিরস্ত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের ঠেঙাতে। হিন্দু সন্ত্রাসবাদের ধুয়া তুলে হিন্দু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের ওপর চালাচ্ছে অত্যাচারের স্টিমরোলার, আর ব্রাহ্মণ রাঁধুনীদের দিয়ে সন্ত্রাসী মুসলমান কয়েদীদের জোগাচ্ছে গোস্ত-রুটি/ বিরিয়ানি খাবার।

মাঝরাতে না হলে কংগ্রেসীদের অসৎ কর্মের প্রেরণা জাগে না। ভারত মাতার দেহ খণ্ডন করে এরা তথাকথিত স্বাধীনতা এনেছে রাত বারোটায়, জরুরি অবস্থা জারি করেছে রাত বারোটায়। বাবা রামদেবসহ হিন্দু সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলীকে মেরে দলা পাকাবার মতলব এঁটেছে রাত বারোটার পর। এখনও পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাত বারোটার পর থেকে। চোর ডাকাতরা চুরি-ডাকাতি করতে বের হয় রাত বারোটার পর। তেমনি দেশের লোকের পকেট কাটতে কংগ্রেসী শাসকরাও ছুরি চালায় রাত বারোটার পর।

আগুন যখন লেগেছে ভালো করেই লাগুক। পুড়ে খাক হয়ে যাক দিল্লীর এই হারেমের শাসন। একটা ভোঁতা প্রেসিডেন্ট ও ন্যাতা প্রধানমন্ত্রীকে মুখোশ করে গণতান্ত্রিক শাসনের নামে পর্দার আড়াল থেকে দেশ চালাচ্ছে এক বিদেশী মহিলা। জাতির কাছে তার কার্যকলাপের জন্য কোনও জবাবদিহি করতে হয় না অথচ তার হাতেই শাসনযন্ত্র পরিচালনার চাবিকাঠি। এমন দায়িত্বহীন বকলমা শাসন ব্যবস্থা কোনও দেশে নেই।

আর অবাক হতে হয় ভারতের সাধু-সন্ন্যাসী

রামলীলা ময়দানে আগত ভক্তদের ওপর মধ্যরাতে পুলিশী নির্যাতন।

সম্প্রদায়ের নীরবতা দেখে। রামদেব ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উপর পুলিশি নির্যাতনের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই তাদের মধ্যে। বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সাধু সম্প্রদায় যদি এই জুলুমবাজির বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন তা হলে সোনিয়া-মোহন সরকারের কোমর ভেঙে যেত, তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করত দেশবাসীর কাছে।

পশ্চিমবঙ্গেও তো অনেক গুরু মহাজন, স্বামী-আনন্দ রয়েছেন। তাঁরাও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন কেন? তাঁরাও তো অন্তত গৈরিক বসনের মর্যাদা রক্ষার্থে ত্রিশূল হস্তে রাস্তায় নামতে পারতেন। দেশ, সমাজ ও ধর্মের পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়ালে শয়তানদের অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে যেত। তা না করে তারা ভোগানন্দ স্বামী সেজে তৈলচিক্কন দেহে চর্বি বৃদ্ধিতে রত আছেন। ধিক্ তাঁদের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য।

যোদ্ধা সন্ন্যাসী রামদেব বেকায়দায় ফেলেছেন ঠিকাদার রাজনীতিকদের

অমলেশ মিশ্র

২০১১ সালের ৪ জুন মধ্যরাতে (ইংরাজী হিসাবে ৫ জুন) ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে গণতান্ত্রিকতার উপর যে পাশবিক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার হলো—স্বাধীন ভারতবর্ষে সম্ভবত: এটি দ্বিতীয় উদাহরণ। প্রথম উদাহরণটি ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জুনে। লক্ষণীয় যে এই অত্যাচারী ধর্ষকটি সেদিনও ছিল কংগ্রেস, আজও সেই কংগ্রেস। বিষয়টি যে কত গুরুতর তা সুপ্রীম কোর্টও বুঝিয়ে দিয়েছেন দিল্লী ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্বতস্ফূর্ত (সুয়োমোটো) নোটিশ জারী করে। স্তম্ভিত সুপ্রীম কোর্ট জানতে চেয়েছেন— কীরকম গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে কয়েক হাজার পুলিশ লাগিয়ে, কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি ব্যবহার করে কয়েক হাজার মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ঘটনা ঘটার প্রায় দু'দিন পরে সাফাই দিলেন যে---কোই চারা নেহি থা---কোনও উপায় ছিল না। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অসহায়তার আর এক উচ্চারণ। সত্যিই তিনি নিরুপায়। দক্ষ কারিগরদের হাতে তিনি এক পুতুল মাত্র। যারা তাকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে তারা চেয়েছে গণতন্ত্রের উপর এই ধর্ষণ। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে গেলে তাকে তো প্রধানমন্ত্রীত্বই ছাড়তে হয়। তিনি তা ছাড়েন কী করে!

৪ জুন শনিবার যোগগুরু রামদেব দিল্লীর রামলীলা ময়দানে তার পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুসারে কয়েক হাজার সমর্থক নিয়ে অনসনে বসেছিলেন। তার এই আন্দোলন ছিল দেশব্যাপী ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। নির্দিষ্টভাবে তাঁর দাবী ছিল যে দেশের ভিতরে ও বাহিরে হিসাব বহির্ভূত যে বিপুল অর্থ (কালো টাকা) সঞ্চিত হয়েছে—সেই অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং সেই অর্থ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। এই মর্মে সরকারকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এই অনশন সত্যাগ্রহ ছিল ১০০ ভাগ শান্তিপূর্ণ। অনশন মঞ্চের একমাত্র বক্তা যোগগুরু রামদেবজী কোনও কটু কথা বলেননি, কোনও উত্তেজনামূলক বক্তব্যও রাখেননি। তার ভাষণ ছিল যে দেশের আর্থিক দুরবস্থার কারণ ওই ভ্রষ্টাচার এবং সরকারকে সেই ভ্রষ্টাচারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলন নৈতিকভাবে প্রতিটি ভারতবাসীরই সমর্থন যোগ্য। রামদেবজীর অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে অনেকে কটাক্ষ এবং তির্যক মন্তব্য করলেও তার প্রত্যুত্তরে রামদেবজী কোনও কটু কটাক্ষ করেননি। আর রামদেবজীর যদি অবৈধ অর্থ থেকেও থাকে ক্ষমতাসীন সরকার তদন্ত করে সেই অর্থও বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন। কিন্তু রামদেবজী অসৎ প্রমাণিত হলেই দেশের ভিতরে ও বাইরে লুকিয়ে রাখা কালো টাকা বৈধ হয়ে যায় না। যেভাবে সেই অনশন মঞ্চে মধ্যরাত্রে আক্রমণ করা হয়েছে তাতে বৈধ হয় না।

মধ্যরাত্রে যখন অনশন আন্দোলনকারীরা নিদ্রাগত তখন কয়েক হাজার পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে, কাঁদুনে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে, নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের টেনে হেঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। মঞ্চের এক অংশে আগুন লাগে। রামদেবজী আত্মগোপন করে সরে যেতে গেছিলেন, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঞ্চ ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করা হয়, ১৪৪ ধারা জারী করা হয়, রামদেবজীর দিল্লী প্রবেশ ১৫ দিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। রামদেবজীর অভিযোগ যে তার গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। এক কথায় পুরো ঘটনাটাই বীভৎস।

ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে যথেষ্ট গর্ব করা হলেও বস্তুত ভারতে চলেছে একরকম রাজতন্ত্র কিংগোক্র্যাসী একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে যা খুশী করার স্বাধীনতা জন্মায়। কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। সংসদে ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত হয় কিংগোক্র্যাসীর সমর্থক সংখ্যার দ্বারা। পরিবারভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা নায়েব গোমস্তার চাতুরীর উপর নির্ভর করে। মানুষের সদিচ্ছা ও আশীর্বাদের উপর নয়।

সরকারের স্বচ্ছতা সম্পর্কে মানুষের অবিশ্বাস তীব্র বলেই যখন তখন সুপ্রীম কোর্টকে নাক গলাতে হয়, ভর্ৎসনাও করতে হয়। এক্ষেত্রেও সুপ্রীম কোর্ট মাথা গলাতে বাধ্য হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপে মানুষ খুশী হয়। আন্না হাজারে বা রামদেবজীর আন্দোলনে স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন মেলে। সরকার একে ভয় পায়। সরকার নিজেকে সংশোধন করতে চায় না। সরকার সাধারণ মানুষের ইচ্ছায় বা স্বার্থে পরিচালিত হয় না। সরকার জনসমর্থন হারিয়েছে বলেই জনরোষ, গণঅসন্তোষকে ভয় পায়। এমনি একটি গণঅসন্তোষের প্রকাশ ঘটছিল ওই শান্তিপূর্ণ অনশন আন্দোলনে। ভীত সরকার গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে সেই গণআন্দোলনের উপর নারকীয় অত্যাচার করলো। পেশীশক্তির কারণে সরকার হয়তো জিতে গেল আপাতত; কিন্তু যে অবিশ্বাস এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, জনগণের সেই অবিশ্বাস থেকেই গেল।

কিছুদিন আগে আন্না হাজারে দিল্লীতে অনশন শুরু করেছিলেন। তিন দিনের মধ্যে সরকার আন্না হাজারের দাবী মেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত সরকার

প্রতারণা করেছে। কিন্তু আন্না হাজারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সরকার অনেক নরম ছিল। রামদেবজীর আন্দোলনে যারা সমর্থন জানিয়েছিলেন—সরকার তাদেরও ভয় পায়, তাদের প্রতিপক্ষ মনে করে—তারা সরকারকে উৎপাটনের ক্ষমতা রাখে। তাই আন্না হাজারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে বর্বরতা ছিল না, রামদেবজীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই পাশবিক অত্যাচার, বর্বরতা ও গণতন্ত্রের ধর্ষণ সাধন করতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে—যে সরকার পরিচালনা করে কংগ্রেস এবং তার পুতুল প্রধানমন্ত্রী।

ঠিকাদার রাজনীতিকদের বেশ বেকায়দায় ফেলেছিলেন রামদেবজী যিনি নিজেকে বিবেকানন্দের ঢং-এ যোদ্ধাসন্ন্যাসী বলেন। ৪৬ বছর বয়স্ক এই যোদ্ধা গুরু যতদিন শুধু যোগ শিবিরে যোগ শিখিয়ে বেড়াতেন ততদিন তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। বৃন্দা কারাত ব্যতীত অন্য কোনও রাজনীতি পেশার লোক প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করেননি। কথা ওঠেনি তার সম্পত্তির পরিমাণ কত—এক হাজার কোটি বা পনের হাজার কোটি, কোথা থেকে তার এই বিশাল সম্পত্তি হলো ইত্যাদি। কথা ওঠেনি যে তিনি যোগ শিক্ষাদানের ব্যবসা করছেন—সামনের সীটে এত টাকা পিছনের সীটে এত টাকা ইত্যাদি। অধ্যাপক টাকা নিয়ে প্রাইভেট পড়ালে আপত্তি নেই, ডাক্তার নার্সিংহোমে টাকা নিলে আপত্তি নেই, খেলার মাঠে সামনের সারি আর পেছনের সারির টিকিটের মূল্যর পার্থক্য নিয়ে আপত্তি নেই, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী কাটমানি নিলে আপত্তি নেই, কিন্তু যোগগুরু যোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য টাকা নিলেই আপত্তি। অন্যেরা বনের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়াবেন, আর যোগগুরুকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হবে। রামদেবজী যা সম্পত্তিই করুন তা লোক ঠকিয়ে নয় এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারেও ব্যয়িত হয় না। জনসেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। উপার্জনের অর্থ কীভাবে ব্যয়িত হয়—সেটি অবশ্যই গুরুতর প্রশ্ন।

তবু রামদেবজীর অর্জিত অর্থ এবং আশ্রম নিয়ে যদি কোনও সন্দেহ সরকার বা অন্য কারুর হয়ে থাকে, তা নিরসনের জন্য তদন্ত কমিটি বসানো যায়। কিন্তু তাতে দেশে চলমান দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার এবং কালোটাকা তো বৈধ হয়ে যায় না। সন্ন্যাসী হলেই আশ্রম খুলে দীক্ষা দিতে হবে—অন্য কিছু করা চলবে না এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কাকে দীক্ষা দিতেন? ঋষি অরবিন্দ কতজনকে দীক্ষা দিয়েছেন? সন্ন্যাসী হলেই দেশের দুরবস্থার কথা বলার অধিকার চলে যায়? অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়ার অঙ্গীকার লুপ্ত হয়? কোনও কিছুর প্রতিকার চাইতে গেলে রাজনৈতিক

মধ্যরাত্রে যখন অনশন আন্দোলনকারীরা নিদ্রাগত তখন কয়েক হাজার পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে, কাঁদুনে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে, নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের টেনে হেঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়।

দলের অফিস খুলে বসতে হবে? রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করতে, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে কোনও রাজনৈতিক দল খুলেছিলেন?

আমাদের রাজনীতিকরা পছন্দ করেন চন্দ্রস্বামীর মতো রসে-বসে থাকা সন্ন্যাসীদের যাঁরা রাজনীতিকদের সঙ্গ দেন। অন্য কোনও ধর্মীয় গুরু যাদের শ্রীচরণে বছরে একবার গিয়ে প্রণাম করা যায়। চাঁদাপত্র দেওয়া যায়।

রামদেবজী একইসঙ্গে সন্ন্যাসীর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এবং রাজনীতিকদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেই কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। তাঁর আন্দোলন ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। কে না জানে যে রাজনীতিক এবং ভ্রষ্টাচার পরস্পর শয্যাসঙ্গী? দেশের টাকা যারা দেশের মানুষকে বঞ্চনা করে লুকিয়ে রেখেছে এবং রাজনীতিকদের মধ্যে যারা এই চুরি সমর্থন করছে রামদেবজীর আন্দোলন সেই চোর, চুরি এবং সমর্থকের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের গায়ে লাগা , ভয় পাওয়া, অস্বাভাবিক নয়। কংগ্রেস এবং দুর্নীতি প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

কালো টাকা নিয়ে তো বিজেপি নেতৃত্ব ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে কথা তুলেছিলেন। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আর তা নিয়ে কোনও আন্দোলন হয়নি। নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস বলেছিল কালো টাকা উদ্ধার করবে। কিন্তু টালবাহানা আর কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া কিছুই করেনি। দেশের আইন, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বাহানা তুলে ১ শতাংশ কাজও করেনি। অথচ এই টাকা উদ্ধার হলে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে একটি হাসপাতাল একটি হাইস্কুল হতে পারত। বিপিএল তালিকা বলে কিছুই থাকত না।

প্রশ্ন উঠেছে রামদেবজীর সমর্থনে কত শতাংশ মানুষ আছেন? প্রশ্নটি সঙ্গত নয়। সঙ্গে লোক না থাকলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, রাজনৈতিক ব্যক্তি না হলে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না এটা কোন গীতা, কোরান, বাইবেলে আছে? আর সমর্থক শতাংশর কথা তুললে তো বলতে হয় এখন যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদের সরকার চালানোর কোনও নৈতিক অধিকারই নাই। এরা সংখ্যাগুরু নন।

রামদেবজীর পিছনে নাকি আর এস এস, বিজেপি আছে। আছে তো দোষ হয়ে গেল? সরকারের দুর্নীতি থাকতে পারে, ভ্রষ্টাচার থাকতে পারে আর তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে—তার পিছনে লোক থাকতে পারবে না? আর এস এস বা বিজেপি নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে ভ্রষ্টাচারের বিরোধিতা করতে পারতেন। করেননি। কিন্তু যিনি করছেন তাঁকে সমর্থন করছেন বা তাঁর পিছনে আছেন। ঠিকই করেছেন। উপযুক্ত ইস্যুতে উপযুক্ত মানুষের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। সারা দেশের সব মানুষেরই এর পিছনে দাঁড়ানো উচিত। তবে অদ্ভুত বিষয় যে, বিজেপি এবং আর এস এস পিছনে থাকলে কালোটাকা বৈধ হয়ে যায় না—গণতন্ত্রের ধর্ষণ আইনী মর্যাদা পায় না। কংগ্রেস এটা বুঝতে চায় না।

ঠিকাদার রাজনীতিকদের ভয় এখানেই। তাদের সাজানো সংসারে তারা কোনও উপদ্রব পছন্দ করে না। রামদেবজী বা পিছনে দাঁড়ানো আর এস এস, বিজেপি-কে এরা উপদ্রব বলে মনে করে। তাঁর জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে এই ইস্যু নিয়ে রামদেবজী রাজনীতিতে এলে—এদের যে একজন প্রতিযোগী দাঁড়িয়ে যায়!

রামদেবজীর যতই বদনাম করা হোক তিনি সাহসের সঙ্গে দেশের দুরবস্থার কারণটি তুলে ধরেছেন। এই কাজটি রাজনীতিক দলগুলি করলে রামদেবজীকে করতে হোত না। আর তিনি রাজনীতির লোক নয় বলেই তার শান্তিপূর্ণ অনশন আন্দোলনের উপর এত বর্বর ও নৃশংস অত্যাচার করতে পারল কংগ্রেস সরকার। গণতন্ত্র ধর্ষণের এই উদাহরণ কংগ্রেসের কলঙ্ক—ভারতের গণতন্ত্রেরও। এই অপরাধের শাস্তি কংগ্রেসকে পেতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

কোচি বন্দরে বইয়ের জাহাজ

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বন্দরের বন্ধন যেমন আছে তেমনি আকর্ষণও। এক একটা জাহাজ ভোঁ বাজিয়ে যখন ঢোকে তখন একরকম, আবার যখন বন্দর ছাড়ে তখন আরেকরকম। যাত্রী বয়ে নিয়ে যায় যেসব জাহাজ তার রীতি নিয়ম গড়ন চলনে একধরনের আকর্ষণ থাকে। মালপত্র নিয়ে যায় যেসব জাহাজ তার মধ্যেও অন্যজীবন। জলযান সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল কমবেশি থাকেই। ১৯৭২ সালকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করেছিল 'আন্তর্জাতিক বই বর্ষ' হিসেবে। ওই সময়ে বইভর্তি একটা জাহাজ কলকাতা বন্দরে এসে নোঙর ফেলেছিল কিছুদিনের জন্য। পৃথিবীর নানা দেশের বন্দর ছুঁয়ে বই-এর জাহাজের বিশ্বপরিক্রমা। বই অনুরাগ জাগানোই উদ্দেশ্য। জাহাজ-ভর্তি বই।

কয়েকদিন আগে একটা খবর নজরে এলো—ওইরকম বইভর্তি জাহাজ কোচি বন্দরে নোঙর ফেলে সকলকে ডাক দিয়েছে,—'এসো আমাদের জাহাজে। এখানে বইয়ের মেলা। দ্যাখো বাছো কেনো।' জাহাজে বই রয়েছে পাঁচ লক্ষের বেশি। পাঁচ লক্ষ বই সাজানো রয়েছে জাহাজ জুড়ে। গ্রন্থপ্রেমীদের ডাক দেওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা মিশে থাকায় দলে দলে বিভিন্ন বয়সী মানুষ ছুটে গেছেন বই দেখতে। জাহাজের নাম লোগোজ হোপ। হোপ মানে আশা। বইকে ঘিরে আশা থাকতেই পারে।

এত বই যেখানে দেখানোর জন্যে সাজিয়ে রাখতে হয়েছে সেখানকার নানারকম কাজ সামলাবার জন্যে রয়েছে চারশোজন মানুষ। সব দেখেশুনে মনে হয় এক শহর। জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, সেজন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে বইয়ের সঙ্গে। জল খাবারদাবার বিনোদনের জিনিস ইত্যাদি। বই প্রদর্শনী আর বিক্রি তার মধ্যে জড়ানো।

এই জলযান জার্মানির। সেখানকার একটি অলাভজনক সংস্থা জি বি এ এই জাহাজের পরিচালক। উদ্দেশ্য জলযানের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সাহায্য আর বিদ্যা পৌঁছে দেওয়া। সেসব জাহাজও ভারতে এসেছে। লোগোজ হোপ-এর মধ্যে বইমেলার ব্যবস্থা রয়েছে।

বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাজানো আছে নানারকম স্মারক আর সংগীতের সিডি। কি বই নেই সেখানে! গ্রন্থপ্রেমীদের বিচিত্র চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ের বই সাজানো। উপরে ডেকে বইয়ের প্রদর্শনী চলেছে। নিচে জাহাজের খোলে ভর্তি বই। চাহিদা অনুযায়ী চলে আসছে। বই ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্যের বই নিয়ে। কাজ করছেন ৪৯টি দেশের স্বেচ্ছাসেবীরা। তাঁরা সকলেই ইংরেজিতে কথা বলছেন। তবে প্রত্যেকের উচ্চারণে মিশে থাকছে দেশীয় টান। সেজন্যে অবশ্য কোথাও কোনও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং চারপাশে আনন্দময় পরিবেশ বইকে ঘিরে।

বইয়ের জাহাজ — লোগেজ হোপ।

বইয়ের জাহাজ ৩৪টি দেশ ঘুরেছে। কোচি হলো ৫৪তম বন্দর। জাহাজটির বয়স ৩৮ বছর। ১৯৭৩-এ তৈরি। যাত্রীবহন করত আগে। ২০০৪ সালে জার্মানির জি বি এ সংস্থা নিয়েছে। কলম্বো থেকে জাহাজ এসেছে কোচিতে। সেখান থেকে যাবে বিশাখাপত্তনমে। তারপরের গন্তব্য থাইলান্ডের দিকে।

বই জাহাজে কাজ শুরু হয় সকাল সাতটায়। অর্থাৎ ওইসময় বই নিয়ে গ্রন্থপ্রেমীদের জন্যে প্রতীক্ষা। সারাদিন চাপ থাকে। বই প্রদর্শন বিক্রি বন্ধ হয় সন্ধে সাতটায়। জাহাজের মধ্যে যাঁরা কর্মী হিসাবে রয়েছেন তাঁরা অনেকদিন বাড়ি থেকে দূরে। পনেরোজনের এক একটা দল করে নিয়েছেন তাঁরা। নিজেদের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠান আনন্দ করেন।

যে জাহাজ বই নিয়ে চলেছে, সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, সেই জাহাজের বাসিন্দাদের কতরকম অভিজ্ঞতা। সমুদ্র তো সবসময় একরকম নয়। কখনও শান্ত, কখনও উত্তাল। আর সেইসঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন বন্দরে বইয়ের টানে আসা ছোটোদের আর বড়োদের সঙ্গে দিন কাটানোর নানারকম অভিজ্ঞতা। কোথাও কোনও ছোট্ট বইপ্রেমী প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে সংগ্রহ করতে পারছে না বই। দেখে খুব খারাপ লেগেছে কোনও স্বেচ্ছাসেবীর। তিনি বলতে পারেননি 'বই রেখে বাড়ি যাও। টাকা না থাকলে বই পাবে না।' বরং তিনি নিজে বই কিনে ছেলেটিকে উপহার দিয়েছেন। আনন্দ পেয়েছেন তিনি বই দিতে পেরে। আনন্দ পেয়েছে ছেলেটি বই পেয়ে।

কোনও বন্দরে জাহাজ নোঙর করার তিনমাস আগে কয়েকজনকে পাঠিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয় এলাকার মানুষের বইরুচি চাহিদা ইত্যাদি সম্বন্ধে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বুঝে নেওয়ার চেষ্টা থাকে জাহাজ নোঙর করলে সাড়া কেমন মিলবে।

কোচি বন্দরে প্রথম সপ্তাহে বই দেখতে এসেছেন ৩০ হাজার নানাবয়সী গ্রন্থপ্রেমী। সেখানে বর্ষা এসে গেছে। তা সত্ত্বেও বই দেখার আকর্ষণ কমেনি। জাহাজে উঠে একসঙ্গে অত বই দেখা আর কেনার মজাই আলাদা। বই কেনার সঙ্গে নানারকম বাড়তি আকর্ষণও রয়েছে। খেলাধুলো, আঁকা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

জাহাজের প্রধান অর্থাৎ কাপ্টেন ৫৭ বছর বয়সী প্যাট ট্রেসি আমেরিকার নৌবাহিনীতে ছিলেন একসময়। জি বি এ সংস্থা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে কাজ করছে জেনে যোগ দেন। তাও হয়ে গেলো পনেরো বছর। তখন একটা ছোট জাহাজ এই কাজ করত। তিনি জি বি এ-র চারটি জাহাজে কাজ করেছেন। কেমন লাগছে এমন বিদ্যের জাহাজ নিয়ে ঘুরতে? জবাব দিয়েছেন খুশিমনে—আমাদের ভালো লাগে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যেতে। কত মানুষ দেখি, কত গ্রন্থপ্রেমী।

বইকে ঘিরে আমাদের সমস্ত কাজ বলে সকলের সঙ্গে ভাব হতে দেরি হয় না। ছোটোরা এসে যখন একটার পর একটা বই দেখে বড়ো আনন্দ পাই। তাদের ঘুরিয়ে জাহাজ দেখাই। অনেক প্রশ্ন তাদের, জবাব দিই খুশিমনে। আমরা অনেক জায়গায় ছোটোদের সঙ্গে জাহাজকর্মীদের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করেছি জাহাজের ডেকে। 'এই গ্রন্থ প্রকল্পের পরিচালক ডোরিন লুকাচ বললেন, 'বইপ্রেমের বন্ধনে সারা বিশ্বকে একসূত্রে গাঁথার জন্যে আমরা এতজন কাজ করে চলেছি আবেগে, আনন্দে।'

অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন নিয়ে আদালতের রায় এড়িয়ে যাচ্ছে অসম সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসম থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় চিহ্নিতকরণ, বাদ দেওয়া এবং এদেশ থেকে বিতাড়ন করার আদেশ দিলেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি বি কে শর্মার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। এই রায় দেওয়া হয়েছে গত ২৬ মে। উচ্চ আদালতের এই রায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ বলেই গণ্য হবে। কেননা জনৈক রুস্তম আলি বনাম অসম সরকার, মরিগাঁও-এর এস পি (বর্ডার) এবং ভারত সরকারের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি শর্মা ওই রায় দেন। গত ২০০৮-এর ৯ সেপ্টেম্বর মরিগাঁও-এর ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রায়ে রুস্তম বিদেশী বলে স্বীকৃত হলেও তাকে বিতাড়ন করা হয়নি। ট্রাইব্যুনালের রায়ে বলা হয়েছিল রুস্তম আলি একজন বিদেশী (বাংলাদেশী) এবং সে বেআইনীভাবে অসমে ঢুকেছে। 'অসম চুক্তি ১৯৮৫' মোতাবেক ২৫ মার্চ, ১৯৭১ ছিল অন্তিম তারিখ (cut off date)। এই তারিখের পর বাংলাদেশ থেকে যে আসবে তাকেই বিদেশী বলে গণ্য করা হবে। রুস্তম আলি বাংলাদেশ থেকে ওই নির্ধারিত তারিখের পরেই অসমে এসেছে।

ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্রায় ১ বছর পরে রুস্তম আলি গুয়াহাটি হাইকোর্টে একটি তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন করে। বিচারপতি শর্মার বেঞ্চ তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে বলেছেন, ওই মধ্যবর্তী সময়ে রুস্তমের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য দায়ী অসম সরকার। মরিগাঁওয়ের পুলিশ সুপার (বর্ডার) এবং ভারত সরকার স্বয়ং রুস্তম আলিকে আটক করা ও বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর বিষয়ে কিছুই করেনি।

রিট আবেদন বাতিল করে দিয়ে অসম সরকার এবং ভারত সরকারকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮-এর মরিগাঁও ট্রাইব্যুনালের রায় দ্রুত কার্যকর করার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত। বেঞ্চ আরও বলেছেন, ৩০ জুন ২০১১-এর মধ্যে রাজ্য (অসম) এবং কেন্দ্র সরকারকে ১৬ সপ্তাহের মধ্যে আদালতকে জানাতে হবে যে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশমতো কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অসম থেকে শীঘ্রাতিশীঘ্র বিদেশী নাগরিকদের ভোটার তালিকায় চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়নের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার ফলে বিদেশীরা জনারণ্যে হারিয়ে যায়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ রাজ্য সরকারকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—

(১) একবার পুলিশ সুপার (বর্ডার) ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে কারও নাম চিহ্নিত করলে তার (পুরুষ/মহিলা) নাম সত্বর ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া দরকার।

(২) এস পি (বর্ডার)-র সম্পূর্ণ দায়িত্ব হলো জেলায় জেলায় বিদেশী নাগরিকদের উপস্থিতির ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করা। এবং ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব হলো—ব্যবস্থাদি পুরো করে বিদেশী নাগরিক বলে অভিহিত করা। কাউকে 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না' জাতীয় অজুহাত আদৌ চলবে না।

(৩) বিদেশী নাগরিক চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে অভিবাসন আইন— ১৯৫০ অথবা ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬, কোন্‌টা প্রযোজ্য তা সংশ্লিষ্ট এস পি-কেই ঠিক করতে হবে। (৪) এলাকার এস পি (বর্ডার)-কে দেখতে হবে অসমে পাসপোর্ট আইন—১৯২০ (ভারতে ঢোকার সময়) প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে যে সব বিদেশী বেআইনীভাবে অসমে বসবাস করেছেন প্রয়োজনে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। (৫) ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন তার আত্মীয়স্বজন এমনকী বাবা-মার সম্বন্ধেও আবশ্যক নথিপত্র ট্রাইব্যুনালকে দেখাতে হবে। (৬) ২৫ নভেম্বর, ২০১০ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার হলফনামা পেশ করেছে। উভয় সরকারকেই দ্রুত বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য পন্থা-পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এজন্য ৫ জানুয়ারি, ২০১১ কেন্দ্র সরকার ষোলো সপ্তাহ সময় চেয়েছিল।

এক্ষেত্রে তাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্দিগ্ধ বিদেশীর বিরুদ্ধে যতদূর সম্ভব প্রমাণ রাখতে হবে। দেরী করার অর্থই হলো দেশের একতা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনা।

ছাত্র-ছাত্রীদের হত্যার দায় স্বীকার উলফা'র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমের ঢেমাজি জেলায় একটি স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন দশজন ছাত্র-ছাত্রীসহ মোট ১৩ জনকে হত্যার দায় স্বীকার করে নিলেন উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম)-র সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়া। একই সঙ্গে তিনি নিহতদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্যও আবেদন জানালেন। প্রসঙ্গত, অসমের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন উলফা'র সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বিগত ২৫ বছরে কমপক্ষে কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন। যাদের বেশির ভাগই নির্দোষ অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

ঢেমাজি-র জেলা প্যারেড গ্রাউন্ডে ২০০৪ সালে ১৫ আগস্ট সকালে বিস্ফোরণ হয়। সে সময় কিন্তু উলফার পক্ষ থেকে ওই বিস্ফোরণের দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। এখন রাজখোয়ার ক্ষমা চাওয়াতে এবার ওই ঘটনা যে উলফাই ঘটিয়েছিল তা নিয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

গত ২৫ মে উলফার শীর্ষ নেতাদের মধ্যে অরবিন্দ রাজখোয়া, দলের আদর্শবাদের প্রবক্তা ভীমকান্ত বরগোহাঞি, শশধর চৌধুরী, প্রণতি ডেকা এবং কাবেরী কাছারি ঢেমাজি শহরে এক জনসভা করেন। সেখানে তাঁরা বলেন, ''ঢেমাজিতে বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তটাই ভুল ছিল। তবে আবেগবশত ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারিনি। তবে আজ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইছি। আমাদের আশা, নিহতদের পরিবারবর্গ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।'' শ্রী রাজখোয়া নির্লজ্জভাবে বলেন, ঢেমাজি বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবারবর্গও তাঁদের সমর্থন করবেন।

প্রসঙ্গত, অসম রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং কেন্দ্র সরকারের বদান্যতায় ওই সব ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী নেতারা বাংলাদেশের ডেরা থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফের হাতে ধরা দেন। পরে তাঁদের দাবী মেনে সবাইকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও উলফা'র সর্বাধিনায়ক পরেশ বরুয়া অজ্ঞাত স্থান থেকে শান্তিবার্তা বানচাল করার জন্য বিবৃতি দিয়ে অনবরত হুমকি দিয়ে চলেছেন।

ওই দিনের সভায় ঢেমাজি, ধাকুখানা এবং মাজুলি থেকে নিহতদের পরিবারের ৫৩ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। উলফা নেতারা নিহতদের স্মৃতিতে সভার আগে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। নিহতদের পরিবারবর্গও দুটি শর্ত দিয়েছে---প্রথমত, শান্তিবার্তায় এই 'হত্যাকাণ্ড'-কেও সামিল করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত উলফাকে ঢেমাজি বিস্ফোরণ ও হত্যার সম্পূর্ণ দায় স্বীকার করতে হবে।

মমতা ও মুসলিম, উভয়ের মদতে উভয়েই লাভবান

ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায়

হিসেবে একশো নয়, দু'শো শতাংশ নির্ভুল ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটার পর একটা নির্বাচন লড়ে তিনি 'উপলব্ধি' করেছিলেন, হিন্দুদের উপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। নানা দলে ভাগাভাগির পর তাদের যে ভোটটা ভাগ্যে জুটবে তাতে গরিষ্ঠতা পাওয়া শক্ত। ক্ষমতায় যদি আসতে হয় মুসলিম ভোট পেতে হবে এবং তার বেশির ভাগটাই। অতএব তাদেরই রসে-বশে রাখতে হবে। 'দুর্জনেরা' একে 'তোয়াজ' বা যা-ই বলুন না কেন, কথায় বার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, চলনে বলনে মুসলিম অন্ত প্রাণ ভাবটা বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই না এবারের নির্বাচনে তাঁর এই সাফল্য! নইলে মোট যে ২৯৪টা আসনের মধ্যে প্রায় ১২৫টায় মুসলমানরাই নির্ণায়ক শক্তি, যেখানে ১০২টা আসনে বামফ্রন্টেরই ছিল একাধিপত্য, সেখানে এবার ছবিটা একেবারে উলটে গেল কী করে? অবশ্য ইঙ্গিতটা দু'বছর আগে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনেই মিলেছিল। তাতে ওই ১২৫টা আসনের মধ্যে ৯৭টিতেই এগিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল পক্ষ। এবারেও ৯০টার মতো আসনে বামফ্রন্টকে পিছনে ফেলে দিয়েছে তারা। অথচ ২০০৬-এর রাজ্য বিধানসভার ভোটে ফ্রন্ট ১০২টা আসন কব্জায় রেখেছিল। মুসলিম প্রভাবিত এলাকাতেই যে শুধু এই ছবি তা নয়, এবারের নির্বাচনে বিজয়ী মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যাটাও বেড়েছে দেখার মতো— এক লাফে ৪৬ থেকে হয়েছে ৫৯। এর মধ্যে তৃণমূল জোট ৪০টির মতো এবং বামফ্রন্ট ১৮। গতবারের তুলনায় ফ্রন্টের মুসলিম বিধায়ক সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের মদতে উভয়েই লাভবান। এই সুযোগে বিভিন্ন দল এবার কত মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক : কংগ্রেস ২৩, তৃণমূল ৩৮, সিপিএম ৪০-এর বেশি, বিজেপি ৬, বহুজন সমাজ পার্টি ১০, ছোট দলগুলি ১১৬ ও নির্দল ৬১, মোট ২৯৪ জনের মতো। অর্থাৎ সাফল্যের হার ২০ শতাংশ। সংখ্যা বাড়ানোর দৌড়ে মুসলিম মহিলারাও ভালই এগিয়েছেন, গতবারের ২ থেকে এবার ৭-এ।

রাজ্য বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ৫৯ হওয়ায় স্পষ্টতই সম্প্রদায় হিসাবে তারা এরাজ্যের জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের আর তেমন দূরে নেই। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার হার ২৮ শতাংশ, এবার তাদের জয় হয়েছে ২০ শতাংশ আসনে। অর্থাৎ আর জনা ২৪ বিধায়ক বাড়ালেই হলো। এবারেই তো একলাফে বেড়েছে ১৩ জন। 'ভোট ব্যাঙ্ক'-এর সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের তাগিদে রাজনৈতিক দলগুলির দাদা-দিদিদের আশীর্বাদ অব্যাহত থাকলে বাকিটা অর্জন খুব একটা কষ্ট ও সময়সাধ্য হবে না!

২০০৬-এর নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু তোষণ-রাজনীতির দৌড়ে দু'পক্ষই তাল ঠুকে লড়ে গেছে। এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায় দ্যাখ।

একপক্ষ ক্ষমতাশীল, তাদের সুবিধা অনেক। দীর্ঘ ঘুমের পর হঠাৎ জেগে উঠে তারা একটার পর একটা সংখ্যালঘু কল্যাণ প্রকল্পের ঘোষণা ও তার রূপায়ণে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়েছে। অপর পক্ষ বিরোধী আসনে থাকলেও পরের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হলে কী কী করবে বইয়ে দিয়েছে তার প্রতিশ্রুতির বন্যাও। মজার কথা, প্রতিশ্রুতি হলেও তৃণমূলের কথা মুসলমানরা বেশি বিশ্বাস করেছে, ফ্রন্ট তথা সিপিএম সংখ্যালঘু কল্যাণে সত্যি সত্যিই কিছু কাজ করলেও তাদের মন কাড়তে পারেনি। নাহলে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি, মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ বৃত্তিদান, তাদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপন, সরকারি কোষাগার থেকে মসজিদের ইমামদের বেতন দেওয়া, ব্যবসা গড়তে সাহায্যের জন্য আলাদা সংখ্যালঘু উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন, চাকরিতে সংরক্ষণ চালু—কত কিছুই না করেছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার। সংখ্যালঘু বিষয়ক একজন মন্ত্রীও নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও মুসলিমদের বিশ্বাস অর্জন করতে না পারার আসল কারণ হলো সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম। দু'জায়গাতেই কৃষি জমির মালিকদের একটা বড় অংশই হলো মুসলমান। প্রথমে সিঙ্গুরে জমি হারানোর অভিজ্ঞতা ও পরে নন্দীগ্রামে জমি হারানোর আশঙ্কা সিপিএমের উপর মুসলমানদের বিরূপ করে তোলে। সিপিএম এইভাবে সর্বত্র তাদের ভিটেমাটি ও জমি ছাড়া করবে এই ভয় তাদের পেয়ে বসে। এটাকেই অবলম্বন করে সিদ্দিকুল্লা প্রমুখ মুসলিম নেতারা প্রথমে মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও সংখ্যালঘু-দরদী হয়ে ওঠার এমন সুযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছেড়ে দেননি। তারপর তা নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস তো সকলের জানা। হ্যাঁ, একথা অনস্বীকার্য যে, এই আন্দোলনই গরিব মুসলিম কৃষকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, সিপিএম নয়, একমাত্র মমতাই তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। মুসলিম ধর্মীয় নেতৃত্বের কণ্ঠেও এমন কথা শোনা যেতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সাচার কমিটির রিপোর্ট; যাতে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত সব দিকেই বেহাল দশা! দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার কিছুই করেনি।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরের ঘটনা পরম্পরা এবং শেষ এই সাচার কমিটির রিপোর্ট সিপিএম-এর উপর মুসলিমদের অবিশ্বাসকে এতটাই মজবুত করে তুলেছিল যে, শেষমেশ মুসলিম স্বার্থে কাজ দেখানোর জন্য তেড়েফুঁড়ে মাঠে নামলেও সিপিএম তার পালে মুসলিম সহানুভূতির হাওয়াকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। পয়লা খেসারৎ দিতে হয়েছিল লোকসভা ও পুর নির্বাচনে, আরও বেশি দিতে হলো বিধানসভা নির্বাচনে।

'দুর্জনেরা' বলে, সিঙ্গুরে বা নন্দীগ্রামে মুসলিম কৃষকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই মমতা অত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, সাধারণ হিন্দু কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে হয়ত মুখ ফিরিয়েই থাকতেন। মুসলিম সমর্থন আদায়ে তিনি কী না করেছেন। বোরখা পরে সিঙ্গুরের ধর্না মঞ্চে নমাজ পড়েছেন। সভায় সভায় বলে বেড়িয়েছেন, লাউডস্পীকারে আজান দেওয়া যাতে বজায় থাকে তারজন্য মামলা লড়তে প্রয়াত তৃণমূল নেতা অজিত পাঁজাকে তিনি আদালতে পাঠিয়েছিলেন। এমনকী এন ডি এ আমলেও সন্ত্রাস-বিরোধী 'পোটা' আইন করার চেষ্টায় তিনি বাধা দিয়েছিলেন, কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, আইনটা মুসলিম-বিরোধী। নির্বাচনী সফরে মুসলিম এলাকাতে গেলেই সাদা লেসের চাদরে মুসলিম মহিলাদের মতো মাথা-মুখ ঢেকেছেন। সর্বত্র 'রাম-রহিম, ঈশ্বর-আল্লা, নমস্কার-আদাব, আশীর্বাদ-দোওয়া' শব্দবন্ধকে বক্তৃতার অঙ্গ করেছেন, ধ্বনি দিয়েছেন 'ইনসাল্লা'। যাই হোক, এত করে চিঁড়ে তো ভিজেছে! মুসলিমদের বিশ্বাস তো অর্জন করা গেছে! এখন দেখা যাক, সাচার সাহেবকে ডেকে এনে মুসলমানদের আরও ভাল করার জন্য তাঁকে পরামর্শদাতা বা ওই জাতীয় কোনও পদ তিনি দেন কি না!

সংশয় যাচ্ছে না ‘পরিবর্তনে’ও

দেবশ্রী চৌধুরী

বামফ্রন্টের যে শাসকরা ধরেই নিয়েছিল তাদের লাল সূর্যের কখনও অস্ত হবে না, সেই সমস্ত বোদ্ধা তালেবর নেতা মন্ত্রীদের অসহনীয় পরাজয় হয়েছে। কোথাও ২০ হাজার কোথাও ৩০-৩৫ হাজারের ব্যবধানে হেরেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতারা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হেরেছেন প্রায় ১৭ হাজার ভোটে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ১১ থেকে ৮১ বাঙালী। কিন্তু এতো বড় একটা ঘটনা ঘটার পরও কোথায় যেন একটা খিচখিচে কাঁটা বিঁধেই রয়েছে বঙ্গবাসীর মনে। যাঁকে দিয়ে পরিবর্তন ঘটল তাঁর উপরে খুব বেশী আস্থা রাখতে পারছে কি তাঁর দলেরই অতিবড় সমর্থকও? কারণ, হাটে মাঠে ছুটে বেড়ানো আর বিধ্বস্ত বাংলায় সুশাসন দেওয়া দুটো জিনিস কখনওই এক নয়।

১৯৯৭ সালে মমতা ব্যানার্জী বাধ্য হয়েছিলেন নিজের দল ছাড়তে। ১৯৯৮ সালে তিনি তৈরি করলেন তাঁর নিজের নতুন দল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। একদিকে তাঁর তৎকালীন পার্টি (কংগ্রেস)-র সহকর্মীদের বিরুদ্ধতা অন্যদিকে শাসকদল সিপিএম-এর আক্রমণ। এই যৌথ সাঁড়াশি আক্রমণে ভীত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নবগঠিত দল নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিজেপি-র দিল্লী নেতৃত্বের কাছে। ১৯৯৮-১৯৯৯ পরপর দুটো লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করেন এবং ভারতবর্ষের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাঁর দলের অভিষেক হয়। ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী হন এন ডি এ তথা বিজেপি জোট সরকারে। এরপর থেকেই তাঁর মধ্যে অস্থিরতার লক্ষণ দেখা দেয়। এই অস্থিরতা তৈরি করার পেছনে কে বা কারা ছিলেন এখন তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। ২০০১ সালে পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা নির্বাচন উপস্থিত হলো। কেন্দ্রে তিনি এখনকার মতোই তখনও রেলমন্ত্রী ছিলেন। তখনও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বই তাঁর উপর আস্থা রাখতেন এবং সেটা এখনকার থেকে কিছু হলেও বেশি মাত্রাতেই ছিল। সেইমতো জোটবদ্ধভাবে (এন ডি এ) পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রত্যাশা করেছিল সিপিএম-কে উৎখাত করা সম্ভব হবে। সেবারেও খুব বেশী মাত্রাতেই পরিবর্তনের বাতাস বইছিল সারা বাংলাতে। হঠাৎ করে নির্বাচনের মাসখানেক আগে তিনি এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। জোট এবং সরকার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তহল্কা ডট্ কমের কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি বাংলার মানুষকে হতাশ করে দিয়ে একদা বিরক্ত কংগ্রেস দলের সঙ্গে গিয়ে জোট বাঁধলেন। ফল যা হবার তাই হলো। তাঁর এই খামখেয়ালীপনার রাজনীতিকে বাঙালী গ্রহণ করল না। তিনি আবার নতুন চক্রান্তের গন্ধ পেলেন তাঁর পুরনো দলের ভিতর থেকে। আবার ফিরে গেলেন সেই এন ডি এ জোটে। দফ্তরহীন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। ২০০৪-এ লোকসভা এবং ২০০৬-এ বিধানসভা (পশ্চিমবাংলা) নির্বাচনে এন ডি এ জোটেই তিনি লড়াই করলেন। ফল আশানুরূপ হলো না। কারণ পশ্চিমবাংলার মানুষ তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারল না।

২০০৮ সালের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচন, ২০১০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন সহ ৮০টি পুরসভার নির্বাচন এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন— ফলেই প্রমাণিত মানুষ একটাই ভাবনা ভাবছে পশ্চিমবাংলা থেকে যেনতেন প্রকারণে সিপিএম-এর বিদায় ঘটানো। পথেঘাটে ট্রামে বাসে একটাই আলোচনা— যা কিছুই হোক না কেন এবার পরিবর্তন চাই। তাই কাণ্ডারী যিনিই হোন না কেন এই জয়ের প্রধান কারিগর বাংলার আপামর মানুষ।

শুরু হলো তাঁর রাজনীতির নতুন অধ্যায়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন। সেই পর্বে গিয়ে দেখা গেল তিনি রাজনীতির লোকেদের নয় বেশীরভাগ অরাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে বেশী পছন্দ করছেন তাঁর সঙ্গে। তখন তিনি রাজনীতিগতভাবে কোথায় আছেন সেটা ব্যাখ্যা করছেন না বা খুলে বলছেন না। স্বাভাবিকভাবে তাঁর এবং তাঁর আন্দোলনের উপর সরকার এবং সরকারী দলের পক্ষ থেকে যে প্রতিরোধ আসতে শুরু করল তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ওইসব বুলি-সর্বস্ব অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের ছিল না। অন্যদিকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার (সিপিএম-কে নিয়ে) এবং রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর বিপদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগল। কিন্তু রাজনৈতিক ধর্মে সাড়া দিয়ে বিজেপি তথা এন ডি এ-র বিভিন্ন নেতৃত্ব তাঁকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর অনশন মঞ্চে শুধু হাজির হওয়াই নয় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়ে ফেরালেন তাঁরা। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। সিপিএম-এর হার্মাদবাহিনী এবং রাজ্য সরকার যখন একযোগে তাঁর রাস্তা আগলে দাঁড়ালো, বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এসে সেই বন্ধ রাস্তাটা খুলে দিয়ে গেলেন তাঁর জন্য। এ সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানে বাংলার মানুষ। বিষয়গুলি এখনও তাদের বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। কিন্তু যখন তিনি সেই বিজেপি-কে পরিত্যাগ করে হাত ধরলেন তাঁর অপছন্দের কংগ্রেস দলের পরিত্যক্ত নেতাদেরই, তখন সাধারণ মানুষ তার অর্থটা সঠিক বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু ততোদিনে মানুষের মধ্যে সিপিএম জমানার অবসান ঘটানো ছাড়া দ্বিতীয় কিছু ভাববার অবসর নেই। তাই মানুষ অন্য কোনও বিচার বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধু সিপিএম খেদানোর রাজনীতিতেই মত্ত হল।

২০০৮ সালের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচন, ২০১০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন সহ ৮০টি পুরসভার নির্বাচন এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন—ফলেই প্রমাণিত মানুষ একটাই ভাবনা ভাবছে—পশ্চিমবাংলা থেকে যেনতেন প্রকারে সিপিএম-এর বিদায় ঘটানো। পথেঘাটে ট্রামে বাসে একটাই আলোচনা—যা কিছুই হোক না কেন এবার পরিবর্তন চাই। তাই কাণ্ডারী যিনিই হোন না কেন এই জয়ের প্রধান কারিগর বাংলার আপামর মানুষ। সেই সাধারণ মানুষই আজ কতোগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন। তাঁদের মনের মধ্যে দ্বন্দ্বদ্বিধা এই পরিবর্তনটা ঠিক হলো তো?

(ক) কেমন ধরনের রাজনীতি করেন তিনি? যাঁর মতিগতি কেউ বুঝে উঠতে পারে না? (খ) যাঁদের কারণে নিজের দল ছেড়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়, তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি চললেন—আসল রহস্যটা কি? (গ) তাঁর যে রাজনৈতিক অভিভাবকরা বিপদের সময় তখ্তে বসে মিটিমিটি হাসছিলেন আর তাঁর শত্রুদেরকে নিয়ে সরকার চালাচ্ছিলেন—সময় বুঝে তাঁর প্রতি—একই রকম আচরণ আবার করবেন না তো তাঁরা? (ঘ) প্রতিহিংসা-র ব্যাপারে তাঁর সহযোগী দলের ঐতিহাসিক রেকর্ড রয়েছে। সুযোগ বুঝে একা পেয়ে সেই প্রতিহিংসা কি আবার তাঁরা চরিতার্থ করতে চাইবেন না? (ঙ) যে সমস্ত অরাজনৈতিক বন্ধুর ঘাড়ে চেপে তিনি নির্বাচনী সমুদ্র অক্লেশে পার হলেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত বুথস্তর পর্যন্ত পৌঁছে পার্টি-র মাধ্যমে উন্নয়নটা করতে পারবেন তো? (চ) ৫০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ, প্রতি-মহল্লাতে মস্জিদ-মাদ্রাসা বানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি—এসব মানুষ শুনেছে। যদি বাস্তবে এটা ঘটতে যায় তাহলে দিদিকেও যে একই রকম শিক্ষা দিতে পারে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভাইবোন—এটা কি তাঁর মাথায় আছে?

চিঠিপত্র

পালাবদলের প্রত্যাশা

(১)

'রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী' (২৩ মে, ২০১১) সংখ্যাটি পড়লাম। বস্তুত, গত ৩৪ বছর ধরে যে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। মমতা দেবীর রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় তা অপসারিত হলো। সিপিএম হারে না---এটা প্রায় একটা 'মিথ'-এর মতো চালু হয়েছিল। সেই মিথের মৃত্যু হলো। বহু প্রতীক্ষিত 'পরিবর্তন' সূচিত হলো। দেখেশুনে মনে হচ্ছে চারদিকে এখন সু-পবন বইছে। কিন্তু এই পালাবদলের মাঝে একটি প্রশ্ন থেকে যায়।

আমরা জানি, মমতা দেবীকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার। তাঁর পছন্দের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল দপ্তর দেন। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে আসেন। কিন্তু এবারকার নির্বাচনী প্রচারে নিয়ম করে সেই বিজেপির বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি সভাতে তীব্রভাবে বিষোদ্‌গার করেছেন। বিজেপিনেতা অরুণ জেটলি এটাকে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির পরিচয় হিসাবে দেখাতে চেয়েছিলেন। আসলে তা নয়। বিজেপির নিন্দা, সমালোচনা করে তিনি এই রাজ্যের মুসলমানদের মন বা ভোট পেতে চেয়েছেন। শুধু বিজেপি বিদূষণে-ই তিনি থেমে থাকেনি, এই প্রচণ্ড গরমে একটি সাদা চাদর দিয়ে মুসলমান রমণীর ন্যায় মাথা ঢেকেছিলেন। ভাবখানা এই, 'আমি তোমাদের লোক।' একই উদ্দেশ্যে 'আল্লার দোয়া', 'খোদা হাফিজ' 'সালাম আলেকুম' জাতীয় আরবি, উর্দু শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করেছেন। 'উর্দু ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢালাও মাদ্রাসা বিদ্যালয় স্থাপনের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের নাম উচ্চারণ করেছেন নিয়ম করে। নজরুল বৃহৎ ভাবের, মহৎ মনের কবি। তাঁর নাম উচ্চারণে কোনও ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না। তিনি তো পশ্চিমবঙ্গের এখন কাণ্ডারী। কিন্তু তাঁর 'প্রিয়' কবি নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি কি তিনি পড়েছেন? পড়েছেন? ''হিন্দু না ওরা মুসলিম?'' ওই 'মা-মাটি-মানুষের' প্রবক্তা মনে হয় নজরুল থেকে পাঠ গ্রহণ করেননি। করলে, 'সংখ্যালঘু খুন হচ্ছে' বলে তিনি আর্তনাদ করতেন না। রাজনৈতিক দাঙ্গায় সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু উভয়েই খুন হয়—হয়েছে। কিন্তু কেবল মুসলমান খুন হচ্ছে প্রচার করে তিনি এক বিপজ্জনক খেলা খেলেছেন। এই খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এবারকার নির্বাচনে মুসলমানরা উজাড় করে তাঁকে ভোট দিয়েছেন। তাই মনে হচ্ছে, এই পরিবর্তনের ফল ভয়াবহ হতে চলেছে। এই পরিবর্তন, শিবাজী গুপ্তর ভাষায় ''১৯৪৬-এর পর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুসলমানদের দাপট দেখাবার পথ পরিষ্কার করেছে।''

—উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, শেওড়াফুলি, হুগলি।

(২)

অবশেষে প্রায় ৩৪ বছর পর বাম অপশাসনের অবসান হলো। রাজ্যবাসী যেন দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার স্বাদ পেল। তবে দুঃশাসনের পরিবর্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে কিনা তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রাজ্যে শান্তিস্থাপন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, শিক্ষার মানের উন্নতি সর্বোপরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই রাজ্যবাসী রাজ্যে পরিবর্তন এনেছেন। এখন নবগঠিত সরকারের প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সেই মর্যাদাকে মূল্য দেওয়া। কিন্তু রাজ্যবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা আদৌ পূরণ হবে তো? মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কতটা সুরক্ষিত থাকবে? প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বাঁধবে না তো? এসব প্রশ্ন মোটেই অমূলক নয়। কারণ কিছুটা হলেও আগামী কয়েক বছর রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকলেও পরবর্তী সময়ে তার ব্যতিক্রম হতেও পারে। ভুললে চলবে না যে সরকারে আসীন তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট নেতৃত্ব কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নয়। ক্ষমতা দখল করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সুবিধাবাদী রাজনীতির ধারক ও বাহক। তাই এ সকল রাজনীতিকরা নীতি, আদর্শের পরোয়া না করে রাজনৈতিক রং বদল করে থাকেন। তাই জোট সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যায়। বাম ও জোট সরকারকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলাটা অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। তবে নবগঠিত সরকারে যদি দুর্নীতি আশ্রয় নেয় তবে সারা বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। এছাড়াও তৃণমূল নেত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী স্বয়ং সংখ্যালঘু তোষণের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাই সরকারের সর্বোচ্চ পদে বসে যদি সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে ওঠে তবে তা রাজ্যের পক্ষে অশুভ সংকেতের বার্তা বয়ে আনবে তা বলা যায়। এহেন অবস্থায় শাসক পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে শাসনকার্যে নিরপেক্ষতা নিয়ে কিছুটা হলেও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। তাই পালাবদলের ফলে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা পূরণ না হলে তৃতীয় বিকল্প শক্তির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

অস্ত্র উদ্ধার

অবশেষে বাংলার অগ্নিকন্যা প্রত্যাশিতভাবে বামপন্থী তথা সিপিএম-কে ধরাশায়ী ও পর্যুদস্ত করে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। বিগত ১৪ মে থেকে আজ ৩১ মে পর্যন্ত ক্রমাগত প্রত্যহ জঙ্গলমহলসহ বিভিন্ন জেলার সিপিএম অফিস বা তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে বিশাল অস্ত্রসম্ভার যৌথবাহিনীর হস্তগত হয়েছে। আরও কত অস্ত্র মজুত আছে বা উদ্ধার হবে কে জানে? তাহলে কি সিপিএম কোনও ভাবে ভোটে জিতে গেলে উক্ত বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার বিরোধী দল বা তথাকথিত ''ওদের'' বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম, নেতাই কাণ্ডের মতো ব্যবহৃত হতো? এটা তো একটা Conspiracy to the Constitution of India। তাহলে দেশের নিরীহ মানুষজনদের এইভাবে হত্যার পরিকল্পনা যে কারণে এক দল করে তার স্বীকৃতি বাতিল হবে না কেন?

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ

৩০ মে স্বস্তিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়া' শীর্ষক রচনাটি প্রকাশের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আমাদের উপনিষদে আছে, 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'; অর্থাৎ সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। কিন্তু বহুদিন আগেই স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়ার গল্প শুনিয়েছেন, যা মিথ্যা। আজকাল নামাজ শিক্ষার বই প্রতিটি মসজিদেই পাওয়া যায়। নামাজ পড়ার ব্যাপারটা খুব সোজা নয়, হিন্দুদের পূজা করার মতো একটা জটিল ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে 'লরেন' বলতেন। তাঁর পক্ষে ওইরকম জটিল আরবি ভাষাতে নামাজ পড়া অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া সুফিয়ারা কোনওদিন নবদীক্ষিতদের নামাজ পড়া শেখাতেন না। জনাব সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যা লিখেছেন তা সত্য। তবে 'যত মত তত পথ' কথাটাও সত্য নয়। সেমীয় মত, অর্থাৎ ইহুদী মত, ইসলাম মত ও খৃস্টীয় মত আর হিন্দু মত এক নয়। সবকটি মত একই পথে যায় না। তার কারণ-সেমীয় মতগুলি শুধুমাত্র প্রবৃত্তিধর্ম; এগুলিতে নিবৃত্তি ধর্ম ব্যাপারটি নেই। মানুষের পারত্রিক ব্যাপারটি শুধুমাত্র স্বর্গ-নরকে সীমাবদ্ধ। কিন্তু হিন্দুধর্মে প্রবৃত্তিধর্ম ছাড়াও নিবৃত্তি ধর্ম আছে; স্বর্গ-নরকে যাওয়া ছাড়াও মানুষ তপস্যার দ্বারা মোক্ষ লাভ করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র হিন্দু পন্থাগুলি নিয়ে যত মত তত পথের কথা বলেছিলেন—ইসলাম ও খৃস্টধর্ম নিয়ে নয়। সব পথের গন্তব্য এক নয়।

—রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

লাদেন ও ভারতের

ইতিহাস

প্রায় প্রতিদিনই বয়স্কদের এক আড্ডা বসে সন্ধ্যায়। ক'দিন আগে আড্ডায় জনৈক বন্ধু বললেন, 'লাদেনকে কে তৈরি করেছে? আমেরিকাই তো তৈরি করেছে।' আর একজন তখনই বলে উঠলেন—লাদেনের কি নিজের বুদ্ধি, চিন্তা, উদ্দেশ্য, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সাহস, দৃঢ় মনোবল, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি কিছুই ছিল না? এ সবই কি আমেরিকা তৈরি করেছে? মঃ কাসিম, সুলতান মামুদ, তৈমুর, সিহাবুদ্দীন ঘুরী, বক্ত-ই আর খিলজি, বাবর, নাদির—এদের কে তৈরি করেছিল?

আমরা ইতিহাস-ভূগোল কম পড়ি। পড়ি খবরের কাগজ। আরব সেনাপতি মঃ বিন্ কাসিম ৭১২ সালে যুদ্ধ করে সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে হত্যা করে তাঁর ছিন্ন মস্তক খালিফার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হিন্দ ও সিন্ধে যুদ্ধ করে কমপক্ষে ১৬০০০ থেকে ২৬০০০ হাজার ভারতের সৈন্যকে হত্যা করে। একাহিনী লেখা আছে জনৈক আরব মুসলিমের লেখা চাচ-নামা গ্রন্থে (দেখুন Elliot and Dowpon(ed.), History, Vol. 1, pp. 181, 203, 205) সুলতান মামুদ কি কম? ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে লুঠ, ধ্বংস, নরহত্যা চালিয়ে ২ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধকে বন্দী করে (দাস বাজারে) বিক্রির জন্য নিয়ে চলে গিয়েছিল। তৈমুর ভারতে ঢুকেছিল ৯০০০০ সৈন্য নিয়ে। একলক্ষ বন্দী ভারতবাসীকে তৈমুর হত্যা করেছিল। বাবর গণহত্যা ('general massacare') করত। নরমুণ্ড দিয়ে পিলার এবং মৃতদেহ দিয়ে পাহাড় বানাত ('Mounts were made of the bodies of the slain, pillers of their heads.'--*Babur-nama,* p. 573)। সিহাবুদ্দীন ঘুরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিল। তারই সেনাপতি বক্ত-ই-য়ার খিলজী বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল। দূরে তার সৈন্য বাহিনীকে অদৃশ্য রেখে ঘোড়া বিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদে ঢুকেছিল। বক্ত-ই-য়ারের বিহার অভিযানের ভয়ঙ্কর খবর লক্ষ্মণসেনের অজানা ছিল না। সেই থেকে বাংলার মানুষ তুর্কী মুসলিম শাসকের আশ্রয়ে। ১২০৬ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীন বাংলায় যে ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে তারই পরিণতি হলো বাংলার মোট ভূখণ্ডের বৃহত্তম অংশ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। এখন মাত্র ⅓ অংশ আছে। বাংলার ভূখণ্ডের ⅔ অংশ আর ভারত নয়।

তাই যা কিছু প্রচার চালানো হয় তাতে অন্ধ বিশ্বাস না করে সত্যানুসন্ধানই শ্রেয়।

—শ্রীকান্ত সরকার, দমদম, কলকাতা।

ভাবনা-চিন্তা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ও সংবাদ-মাধ্যম

রণজিৎ সিংহ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল শান্ত পরিবেশে। গণ্ডগোলের আশংকা ছিল। কিন্তু সেই দুর্ঘটনা ঘটেনি! এই সুস্থ নির্বাচন পরিচালনার জন্যে নির্বাচন কমিশন সকল নাগরিক ও দলের ধন্যবাদের পাত্র। নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত এই বিপুল রায়! সব আঁচ-অনুমানের বাইরে! তা হলেও সকল ভোটার এবং দলকে এই নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে হবে। কেননা এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক। তৃণমূল কংগ্রেস- কংগ্রেস জোট সরকার গঠিত হয়েছে। এখন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই সরকারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যেতে হবে। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় '**Eternal Vigilance is the Price of Liberty**' অর্থাৎ 'সদা সতর্কতা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মূল কথা।'

সাধারণ নির্বাচন ও তার আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ আজ সমাপ্ত। তাই এই নির্বাচনের নানা দিক্ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার প্রচার-মাধ্যম। প্রচারের জোরে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়, বিরাট অঘটন ঘটে যায়। এবারের নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকে আজও পর্যন্ত অধিকাংশ মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম একটি জোট ও তার নেতা-নেত্রীদের সভা-সমিতি; ভাষণ, সাক্ষাৎকার নানাভাবে ফলাও করে ভোটারদের কাছে উপস্থাপন করেছে ও করছে। সংবাদপত্র ও টিভিতে অন্য দলের খবরাখবর খুব কমই দেখা ও শোনা গেছে। স্বাধীনতার পর গঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীর নিজেদের সংবাদগোষ্ঠী ছিল, কিন্তু কোনও নির্বাচনে ওই মাননীয় মন্ত্রী ও তাঁর দলের স্বপক্ষে জনসাধারণকে 'মত' দিতে আহ্বান করা হয়নি এই সব সংবাদপত্রে! সকল মত ও পথকে সমান সম্মান দেওয়া হয়েছে। আরেকটি সংবাদপত্রেও সেই সময়কার শাসকগোষ্ঠী ও বিরোধী দলের খবর প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকোচ করতে দেখা যায়নি। উভয়পক্ষের সমালোচনামুখর ছিল। কোনও দল বা পক্ষ, তার নেতা-নেত্রীদের বড় করার কথা ভাবেনি! আজ আনন্দ, গর্বের সঙ্গে অধুনালুপ্ত 'যুগান্তর'-'অমৃতবাজার'- 'দৈনিক বসুমতীর' বলিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা বারবার স্মরণে আসে।

দীর্ঘ ৩৫ বছর বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। এখানেও সত্য হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই সত্যকথন '**Power Corrupts, absolute power corrupts absolutely**' অর্থাৎ 'নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে সম্পূর্ণভাবে।' বামপন্থী শাসনের সূত্রপাত গৌরবময় ভূমি-সংস্কার দিয়ে, যার তুলনা সারা ভারতে মেলা ভার। তারপর সর্বস্তরের শিক্ষকদের ক্রমান্বয়ে বৃত্তিগত মানোন্নয়ন, কারখানার বন্ধ অবস্থায় শ্রমিকদের ভাতাপ্রদান, অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এইসব কল্যাণমূলক কাজ ছাড়িয়ে বামপন্থী নেতা-কর্মীদের উদ্ধত ব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি, যথেচ্ছ হিংসার পরিবেশ ভোটারদের কাছে তুলে ধরেছিল সব ধরনের 'মিডিয়া'। প্রতিপক্ষের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। এখানেই বামপন্থী সরকারের পতনের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে বামপন্থীদের এই ধরনের শোচনীয় অবস্থা চিত্রিত, সেখানে স্বাভাবিক কারণেই বিজেপি পরিচ্ছন্ন মূর্তিকে সম্বল করে সাধ্যমত শক্তি, সামর্থ্য নিয়ে লড়েও নির্বাচনে সফল হতে পারল না! এইরকম পরিস্থিতি বহু বছর আগে ভারতীয় জনসংঘের তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ সকল নেতা, কর্মীদের উৎসাহিত করে বলেছিলেন, "**Election not be all or end all. Stick to your principles.**" অর্থাৎ "একটা নির্বাচনই শেষ কথা নয়। নিজেদের নীতি, সততাকে ধরে কাজ করে যাও"। এবারের বাংলার সাধারণ নির্বাচনের পর পরাজিত সকল পক্ষকে আচার্য ঘোষের এই যথার্থ পরামর্শকে মেনে সৎ, নীতিনিষ্ঠ কার্যক্রম নিয়ে চলতে হবে। ধীরে ধীরে সমগ্র পরিস্থিতিকে তারা অনেকটা অনুকূলে আনতে পারবে।

ষোড়শ মহাজনপদ

মল্ল

মল্ল রাজ্যের অবস্থান ছিল সম্ভবতঃ বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়। মল্লরাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের রাজধানী ছিল কুশিনারা, অন্যভাগের রাজধানীর নাম পাবা। গোরক্ষপুর জেলার ছোট গণ্ডকের তীরে কাশিয়া নামক গ্রামটি কুশিনারা বা কুশিনগর বলে ভারততত্ত্ববিদ উইলসন ও ক্যানিংহাম মনে করেন। কুশিনগরের ১২ মাইল উত্তরপূর্বে প্যাডারাওনা গ্রামকে কানিংহাম পাবা নগরী বলে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে যেস্থানে গণ্ডক নদী প্রবাহিত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে সেখানে হিরণ্যবতী নামে এক নদী প্রবাহিতা ছিল বলে বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই হিরণ্যবতীর তীরে শালকুঞ্জে ভগবান বুদ্ধ মহানির্বাণ লাভ করেন। কুশীনগরের অতীত গৌরব উল্লেখ করে বুদ্ধ তাঁর মহানির্বাণের জন্য এই স্থানটিকে বেছে নেন। তিনিই বলেছেন কুশিনারা অতীতের কুশাবতী।

মনু লিচ্ছবীদের সঙ্গে মল্লদেরও 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন। বিদেহ-র

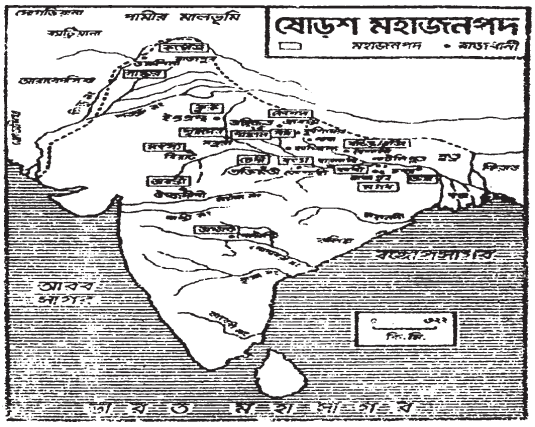

মতো মল্লরাষ্ট্রেও প্রথম দিকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ বুদ্ধের সমসাময়িক কালে মল্লরাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই মল্লরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। মল্লরাষ্ট্রে যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন রাজধানীর নাম ছিল কুশাবতী কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজধানীর নাম হয় কুশীনারা। মহাপরিনির্বাণ গ্রন্থে কুশীনারা একটি ছোট নগর বলে কথিত আছে।

মল্লরা কখনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ লিচ্ছবীদের শত্রু আবার কখনও মিত্ররূপে দেখা দিয়েছিল। ভদ্দশাল জাতকে মল্ল ও লিচ্ছবীদের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। আবার জৈন্য কল্পসূত্রে এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

পাবা নগরীর এক কর্মকার গৃহে তথাগত বুদ্ধ 'সুকরমাদক' অর্থাৎ শুকরের মাংস খেয়ে রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন। উল্লেখ্য বুদ্ধ সঙ্গীদের কাউকে ওই মাংস খেতে দেননি। অসুস্থ বুদ্ধপ্রধান শিষ্য আনন্দকে বললেন— 'কুশীনারায় চলো'। শিষ্যরাও বুঝতে পেরেছিলেন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিন আগত। তাঁরা চাইলেন কোনও বড় নগরীতে বুদ্ধকে নিয়ে যেতে কিন্তু বুদ্ধ অবিচল। তিনি দেহরক্ষা করবেন কুশীনারায়। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী কুশীনারায় হিরণ্যবতীর তীরে শালকুঞ্জে রাখা হলো বুদ্ধকে। পূর্ণিমার রাত বুদ্ধের চারপাশে জাগ্রত শিষ্যবৃন্দ। সবাইকে কাঁদিয়ে মহাপরিনির্বাণ ঘটলো তথাগতের।

'মল্ল' জনপদের পাবা নগরে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর দেহত্যাগ করেছিলেন। আর এই মল্লের কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন তথাগত বুদ্ধ। এই দুই মহাপুরুষের ইহলীলা সম্বরণের স্থান হিসাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মল্লের গুরুত্ব অপরিসীম।

মালদার তুলসী বিবাহ মেলায় ঘোড়দৌড়

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার কালিয়াচক ২নং ব্লকের রথবাড়ি গ্রামে ১৭৫ বছরের পুরানো প্রথা অনুসারে গত ১ জ্যৈষ্ঠ ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রথবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সদুল্লাপুরের নিকট রথবাড়ি গ্রামে তুলসী বিবাহ মেলাকে ঘিরেই বহুদিন থেকে চলে আসছে ঘোড়-দৌড়ের পালা। কথিত আছে তুলসী গাছের বিবাহ দিয়ে বহু বছর আগে এলাকার রাজা কুট্টানন্দ সিং প্রথম এই ঘোড়া দৌড় শুরু করেছিলেন। সেই রাজা এখন না থাকলেও তুলসী বিবাহ মেলা ও ঘোড়া দৌড় এখনও চলছে। এই উপলক্ষে গত ১৬ মে বিকেলে কালিয়াচক ও মাথাবাড়ি থেকে অনেকেই এসেছিলেন ঘোড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। মন্দিরের ইষ্টদেবতাকে তুষ্ট করতে রাজাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেই প্রতি বছরে এলাকার মানুষ নিষ্ঠা সহকারে তুলসী গাছের বিবাহ দিয়ে এই মেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে এই মেলার দায়িত্ব রয়েছে সদুল্লাপুর গ্রামের চৌধুরী পরিবারের উপর। পরিবারের চার ভাই অরুণ, রাজু, সঞ্জয় ও বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা ও মেলার আয়োজন করে থাকেন। বিশ্বনাথ চৌধুরীর কথায়, রাজা কুট্টানন্দ সিং ১৯৩৬ সালে প্রথম এই এলাকায় ঘোড়া দৌড় এবং তুলসী বিবাহ মেলার প্রচলন করেন। রাজা কুট্টানন্দ মারা যাওয়ার পর থেকে চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষরা এই মেলা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখ থেকে ঘোড়া দৌড়ের মাধ্যমে সূচনা করে আসছেন। প্রতি বছর ২০টি করে ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এরপর রাধাগোবিন্দ এবং বলরামের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এবারে তিন হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল। মেলা চলবে ৫ দিন ধরে। রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবু চৌধুরী জানিয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী এই মেলার নামডাক জেলার বাইরেও আছে। ভক্তদের সুবিধার জন্য স্থানীয় অঞ্চল থেকে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে মেলাকে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয় বলেই স্থানীয়দের অভিমত।

অযোধ্যায় অস্থায়ী মন্দিরে স্বমহিমায় রামলালা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অযোধ্যার অস্থায়ী মন্দিরের অস্থায়ী পুরোহিত এখন ৩৭ বছরের প্রেমচাঁদ। পূজারীর কাজে তাকে বহাল করা হয়েছে ১৯৯৭ সালে। এখন তিনি সকালে ভক্তদের পক্ষ থেকে মন্দিরের পুজোর কাজ করছেন। ভোর চারটের ঘুম থেকে উঠে পাঁচটার মধ্যে মন্দিরে পৌঁছোন। সেখানে গিয়ে সকালের প্রার্থনা শুরু করেন। ৭ টার সময় আরতি হয়। দুপুরে মন্দির বন্ধ হয় প্রতিদিন। প্রেমচাঁদ ও অন্যান্য পূজারী কিছুটা সময় পান বিশ্রামের। সন্ধ্যা-আরতির প্রস্তুতি চলে বিকেল দুটো থেকে। তা চলে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। কোনও কোনও দর্শনার্থী প্রেমচাঁদকে প্রশ্ন করেন, মসজিদ কোথায়? প্রেমচাঁদ তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সবার উপরে রাম। তাঁর পায়ের তলায় ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। ভরত মাঝখানে একপাশে লক্ষ্মণ, অন্যপাশে শত্রুঘ্ন। প্রেমচাঁদ দিনে কয়েক হাজার বার সুর করে একথা বলেন পূজার্থীদের সামনে। অযোধ্যার অস্থায়ী মন্দিরের এটাই এখন মূলমন্ত্র।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ আর রামজন্মভূমি নিয়ে বিতর্ক চলছে অনেক বছর ধরে। দেশের রাজনীতিতে অনেক টানাপোড়েন হয়ে গেছে অযোধ্যা নিয়ে। সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও নেই—একথা বলে বিতর্কে জল ঢালার উদ্যোগ হলেও তা আমল পায়নি। হিন্দু আর মুসলমান নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণের জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আইনের লড়াই চলছে। স্থানীয় আদালতে ফয়সালা হবার সম্ভাবনা না থাকায় তা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে চলে গেছে।

বিতর্কিত জমি নিয়ে আইন আদালতে চাপান উতোর চলেছে। তবে আদালত একটা ব্যাপারে বাধা দেয়নি। অযোধ্যার অস্থায়ী মন্দিরে নিয়মমাফিক পুজোআচ্চা চলতে পারে। সেই পুজো চলছে ১৯৯৩-এর ৭ জানুয়ারি থেকে বিশেষ আইন অনুযায়ী। এখনও তা বহাল থাকায় যথারীতি প্রেমচাঁদের কাজ বজায় রয়েছে।

অস্থায়ী মন্দিরে প্রেমচাঁদের সঙ্গে আরও তিনজন পুরোহিত আছেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দায়িত্ব। মন্দিরের মূল পুরোহিত সত্যেন্দ্র দাস। তিনিই চারজন পুরোহিতকে নিয়োগ করেছেন।

প্রেমচাঁদ মন্দিরে সকালে যেভাবে কাজ করেন তা বলেছেন : 'প্রথমে আমি দেবতাদের ঘুম ভাঙাই। তারপর আনুষ্ঠানিক স্নান। তাদের বিভিন্ন পোশাক পরাই। একেক দিনে একেক রকম সাজ। সোমবার সাদা, মঙ্গলবারে লাল, বুধবার সবুজ, হলুদ পোশাকে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার হালকা হলুদ, শনিবারে নীল। আর রবিবারে লাল।' সাজাতে এক ঘণ্টা লাগে। তারপর শুরু হয় সকালের আরতি।

ঠিক সময়ে আরতি শুরু হয়। দেরি হলে বোঝা যায় মন্দিরের নিরাপত্তারক্ষীদের উপর বেশ চাপ পড়ছে। ভিড় খুব বেশি হলে ভক্তদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। প্রেমচাঁদ দ্রুত কাজ সারেন। আধা ফৌজি নিরাপত্তারক্ষীরা যথেষ্ট সময় পান দর্শনার্থীদের সার দিয়ে ঢোকানোর ব্যাপারে। এখন নিয়ম আছে একসময়ে একজন করে দর্শনার্থী মন্দিরে ঢুকতে পারবেন পুজো দেওয়ার জন্যে। প্রেমচাঁদ প্রত্যেককে প্রসাদ দিয়ে একই কথা বলেন, সবার উপরে রামলালা।'

প্রতিদিন কয়েক হাজার ভক্ত আসেন অস্থায়ী মন্দিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। প্রেমচাঁদ মারাঠী ও তেলুগু ভাষার কয়েকটা শব্দ শিখে নিয়েছেন ভক্তদের জন্যে। এখন তিনি দর্শনার্থীদের মুখ দেখে বুঝতে পারেন কে কোন প্রদেশ থেকে এসেছে।

এরকমই চলেছে সারাবছর। তারমধ্যে হঠাৎ অন্যরকম অবস্থা সৃষ্টি হলো ২০০৫-এর ৫ জুলাই। সন্ত্রাসবাদীরা সেদিন মন্দিরে হামলা চালায়। প্রেমচাঁদ বলেছেন, 'আমি গুলির আওয়াজ শুনি। লুকিয়ে ছিলাম মন্দিরের ভিতরে কয়েক ঘণ্টা। পরে পুলিশ এসে বলল সন্ত্রাসবাদীরা মারা গেছে। ঘটনাটা আমাকে যথেষ্ট মানসিক আঘাত দিলেও মন্দির ছেড়ে যাইনি।'

১৯৯৭ থেকে কাজ শুরুর পর ১৪ বছর কেটে গেছে। প্রধান পুরোহিত সত্যেন্দ্র দাসের বয়স ৭২ বছর। প্রেমচাঁদ বললেন, 'আমি প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করি ১৯৯৭ সালে। তিনি এমন একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী খুঁজছিলেন, যার উপর অস্থায়ী মন্দিরের পূজার দায়িত্ব দেওয়া যায়।' প্রেমচাঁদের বাড়ি বাস্তি জেলায়। ফৈজাবাদের সকেট ডিগ্রি কলেজের আইনের স্নাতক।

সত্যেন্দ্র প্রতিমাসে কাজের জন্যে প্রেমচাঁদকে ৩,২০০ টাকা দিয়েছেন। সত্যেন্দ্র দাস সরকার থেকেপ্রতিমাসে ৪৮,৩০০ টাকা পান পূজা করার জন্যে। চারজন পুরোহিত ছাড়া আরও তিনজনকে নিয়োগ করেছেন মূল পুরোহিত। একজন রাঁধুনি, একজন ভাণ্ডার রক্ষক, একজন সহায়ক। এঁরা মন্দিরের রান্নাবান্না সামলায়।

সত্যেন্দ্র দাস নগরে ঘোরেন একটা স্করপিও গাড়ি চড়ে। এই গাড়িটি ভক্তদের দেওয়া। তিনি গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন মানস মন্দির পর্যন্ত, যেখানে স্কুলের প্রবেশাধিকার নেই। এই সুযোগটা রয়েছে যেসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অস্থায়ী মন্দিরে আসেন তাঁদের নিয়ে মানসের মন্দিরে যান সত্যেন্দ্র।

অন্যান্য পুরোহিতের মতো সত্যেন্দ্রও নিয়ম মানেন। তবে তাঁর কাজে তাড়াহুড়ো ব্যাপারটা থাকে না। তাঁর মূল কাজ তরুণ পুরোহিতরা মন্দিরের যাবতীয় কাজ ঠিকমতো করছে কিনা তা লক্ষ্য করা। তিনি প্রতিদিন সকাল দশটায় মন্দিরে যান। সব দেখেশুনে নেন। একবার রান্নাঘরে যান। দেখেন ভোগ তৈরির সব উপকরণ ঠিকমতো আছে কিনা। দুপুরে প্রতিদিন মন্দির বন্ধ। ভগবান তখন নিদ্রা যান। তার আগে ভোগ নিবেদনের আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়। বিকেলে মন্দির ভক্তদের জন্যে খোলা থাকে দুটো থেকে ছটা।

যখন প্রেমচাঁদের কাজ শেষ হয় তখন অন্য পুরোহিত তাঁর জায়গায় এসে ভক্তদের প্রসাদ দেন আর একই সুরে বলেন, 'সবার উপরে রামলালা'।

তাওয়াং-এর শিলা হ্রদ।

রূপসী তাওয়াং

নিমাই মুখার্জী

ভারতের পূর্ব প্রান্তের এক রাজ্য অরুণাচল, ভৌগোলিক সীমানায় যার গুরুত্ব অপরিসীম। এর তিনটি দিকই বিদেশী রাষ্ট্রে ঘেরা—একদিকে ভুটান, অন্যদিকে তিব্বত তথা চীন, আর একদিকে মায়ানমার। কেবলমাত্র দক্ষিণদিকটাই ভারতের এক অঙ্গরাজ্য অসমের সঙ্গে যুক্ত। তাই এখানে যেতে হলে অসম দিয়েই যেতে হবে। যেহেতু রাজ্যটার ভৌগোলিক অবস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে এখানে যেতে হলে Inner Line Permit নিয়ে যেতে হয়। ভারতীয় ভ্রমণার্থীরা অনায়াসেই এই permit পেয়ে যান। বিদেশীদের ক্ষেত্রে কিছুটা কড়াকড়ি করা হয়।

অরুণাচল রাজ্যে ১৬টি জেলা রয়েছে। এর উত্তর-পশ্চিম কোণে যে জেলাটি অবস্থিত, তার নাম তাওয়াং। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত হওয়ায় এরাজ্যের সবটাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। কোথাও অত্যুচ্চ পাহাড়, কোথাও তুষার ধবল পর্বত শৃঙ্গ, কোথাও চিরহরিৎ অরণ্যানী, কোথাও বা কলতানে প্রবাহিত খরস্রোতা পাহাড়ী নদী যা নয়নাভিরাম ঝরণানির্গত।

তেজপুর থেকে অসম ছাড়িয়ে তাওয়াং যেতে হলে প্রথমেই পড়ে অরুণাচল রাজ্যের ভালুকপঙ্। এখানে চেকপোস্টে ILP (Inner Line Permit) দেখালে এই রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি মেলে। ভালুকপঙ্ থেকে বমডিলা যাবার পথে দেখা যায় অপূর্ব কয়েকটি জলপ্রপাত। নৃত্যের তালে তালে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। এরকম বিখ্যাত একটি জলপ্রপাতের নাম 'বৈজয়ন্তীমালা ফলস্'। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কামেং নদী। অসমের জিয়াভরালি নদীই অরুণাচলে কামেং নামে পরিচিত। নদীর উপলখণ্ডে চোখ রাখলে মনে হয় যেন কোনও অচিন রাজ্যে এসে পড়েছি। স্রোতস্বিনীর কলতান মনকে কোনও এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিয়ে যায়।

তেজপুর থেকে ভালুকপঙ্ ৬৯ কিমি, ভালুকপঙ্ থেকে বমডিলা ১০০ কিমি, বমডিলা থেকে দিরাং ৪২ কিমি, দিরাং থেকে তাওয়াং ১৩৮ কিমি— অর্থাৎ তেজপুর থেকে তাওয়াং এর মোট দূরত্ব ৩৪০ কিমি, যার পুরোটাই বাস অথবা টাটাসুমো, সাফারী জাতীয় চারচাকার গাড়ীতে যেতে হয়। এ পথ কোথাও খুবই উঁচু, কোথাও বা খুবই নীচু, কোথাও খাদের কিনারা ধরে যেতে হয়।

এ পথে প্রথম চমক লাগানো পাহাড়ী শহর বমডিলা। এখানে হোটেলের জানালা খুললে মনে হবে মেঘ যেন ঘরে ঢুকে পড়েছে। অল্পদূরে সবুজ পাহাড়ের উপর নীলাকাশ, মাঝে বরফের সাদা চাদর বিছানো। নীল, সাদা সবুজের সমারোহ একসঙ্গে খুব নিকট থেকে দেখার আনন্দই আলাদা। এখানে ভারী সুন্দর একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রি রয়েছে যার অনুশাসন লক্ষণীয়।

বমডিলা পেরিয়ে বিখ্যাত এলাকা দিরাং। নদীর নামে শহরের নাম। মূল রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দিরাং নদী। অপর পাড়ে ছোট্ট, সাজানো, ফুলের মতো সুন্দর শহর দিরাং। মূল পথ থেকে নদী পেরোতে কয়েকটা লোহার সেতু। চলার পথে উঁচু পাহাড় থেকে এই পার্বত্য শহর বা ছোট ছোট এলাকাগুলি নয়নাভিরাম।

দিরাং ছাড়িয়ে তাওয়াং এর উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে পড়বে সেলাটপ্ বা সেলা পাশ, উচ্চতা ১৩,৭০০ ফুট। অত্যন্ত ঠাণ্ডা। মে মাসে এর temperature ৩° সেলসিয়াস এবং মাইনাস ১৮° সেলসিয়াস হয়ে যায়। এখানেই রয়েছে ১ কিমি দীর্ঘ এক পাহাড়ী জলাশয়—প্যারাডাইস্ লেক। এই সেলা টপেই ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের সময় যশোবন্ত সিং রাওয়াত্ একা লড়াই করে বহু চীনা সৈন্য হত্যা করেন এবং ৭২ ঘণ্টা চীনা সৈন্যদের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন দেশপ্রেমে উদ্বেল 'সেলা' নাম্নী এক বীরাঙ্গনা সাহসী পাহাড়ী রমণী, যিনি মৃত চীনা সৈন্যদের বন্দুক, গোলাবারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয় অস্ত্রাদি এনে যশোবন্তকে দেন, যা দিয়ে তিনি দীর্ঘ ৭২ ঘণ্টা লড়াই চালাতে পারেন চীনা সৈন্যদের বিরুদ্ধে। অবশেষে যখন হাজারে হাজারে চীনা সৈন্য আসতে শুরু করে এবং যশোবন্তের গোলাগুলি শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি আত্মঘাতী হন এবং সেলা পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সেই থেকে এই এলাকার নাম সেলা টপ্ বা সেলা পাশ।

সেলা টপ্ বা তার কিছুটা আগে থেকেই তাওয়াং যাওয়ার পথে দেখা যায় চমরী গাই, মিথুন প্রভৃতি নানা পাহাড়ী প্রাণী যা সবই লোমশ। শীতের আধিক্য হেতু এদের শরীরের লোম দীর্ঘ হয়। তাওয়াং-এর পথে পড়ে বিখ্যাত জং জলপ্রপাত। পথশোভা অধিকরতর সুন্দর হয়ে উঠে পাহাড়ী নদী, ঝরণা, পাইন, ফার প্রভৃতি অরণ্যানী ও বরফাবৃত পাহাড় চূড়োর জন্য। দূরের পাহাড় ঢালের কৃষিক্ষেতেগুলি এলাকার সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে দেয়।

অবশেষে তাওয়াং—উচ্চতা ১০,১৪৪ ফুট—সেলটিপ্ থেকে ৩৫০০ ফুটেরও নীচে অবস্থিত। পাহাড়ের ঢালে ঢালে অবস্থিত এই শহর। এখানে কৃষিক্ষেত নেই বললেই চলে। কাশ্মীর বা দার্জিলিং-এ যে উপত্যকা রয়েছে, এখানে তা নেই। তথাপি এর আয়তন কোনও অংশে ছোট নয়। তাওয়াং জেলার মোট আয়তন ২০৮৫ বর্গ কিমি। তাওয়াং জেলার বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কোথাও ৩৫০০ ফুট, কোথাও বা ২২,৫০০ ফুট উঁচু সমুদ্রতল থেকে।

আধুনিক শহরের যা স্বাচ্ছন্দ্য তা সবই মেলে তাওয়াং-এ, যথা—ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, নার্সিংহোম, দোকানপাট, রাস্তাঘাট, যানবাহন, বৈদ্যুতিক আলো, হোটেল এবং জলের তো কথাই নেই। তাওয়াং থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে বুমলা পাশ যা দিয়ে চীনা সৈন্যরা ১৯৬২ সালে ভারতে ঢুকে ভারতের কিছু শহর ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর দখল করে।

পরে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ওইসব শহরের দখল ছেড়ে দেয়। তবে ভারতের বেশ কিছু এলাকা এখনও চীনের দখলে রয়েছে—সে এক আলাদা বিষাদভরা দুঃখের কাহিনী।

বুমলা থেকে তিব্বতের দূরত্ব মাত্র ৪০ কিমি। পথে রয়েছে অসংখ্য ভারতীয় সেনা বাঙ্কার। এ পথেই রয়েছে নীলরং-এর এক জলাশয়—বুমলা লেক বা মাধুরী লেক। বুমলা থেকে তাওয়াং শহরকে ছোট্ট এক সাজানো পাহাড়ী শহররূপে দেখা যায়।

বমডিলা থেকে তাওয়াং হয়ে বুমলা—সমস্ত পথেই মন মাতানো পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। বিচিত্র রং-বেরং-এর সে সব ফুল। রুদ্রপ্রয়াগের নিকট valley of flowers-এর যে সৌন্দর্য—এখানে তার কোনও অংশেই কম নয়। ফুল, ঝরণা, পাহাড়ী নদী, হিমবাহ, চমরীগাই, অরণ্যশোভিত পর্বতরাজি— সব মিলিয়ে তাওয়াং এক মোহময়ী রূপসী; যার রূপ দাঁড়িয়ে দেখার চেয়ে চলতি পথেই যেন বেশী উপভোগ করা যায়।

সাক্ষরতায় এগিয়ে মহিলারাই

ইন্দিরা রায়

কিছুদিন আগেই তো 'নারী দিবস' উদ্‌যাপিত হলো। দিনটা ছিল ৮ মার্চ। সম্প্রতি আবার 'বিশ্ব মাতৃদিবস' পালন করা হলো। শুধু বোধহয় বছরে একবারই নারী তার গুরুত্ব পায় 'নারী' হিসেবে। 'মায়ের মত কেউ হয় না', 'মা হলেন জন্মদাতা', 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' ইত্যাদি ইত্যাদি কত ভাষায় শব্দে বিশেষণে ভূষিত করার পালা চলে। ব্যস্, এরপর বাকি দিনগুলো! নারী সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করা হয়—মেয়ে সন্তান জন্মানো পাপ। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় আরেক নারী যিনি জন্মদাত্রী, তাঁকে মারধর করে মেরে ফেলার তোড়জোড়, কোথাও—আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে নবজাতিকাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয় অথবা রাস্তার আস্তাকুঁড়ে জঞ্জালে চিরকালের জন্য ফেলে দিয়ে আসা হয়। কিন্তু তারা কি একবারও ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখে না যে, আজকে মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল বলেই না পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখছে, ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছে মায়েরই সান্নিধ্যে তাঁরই লালন-পালনে।

না, জীবনে বড় হয়ে সব ভুলে গিয়ে মায়ের জাতের ওপরই চলে অকথিত নির্যাতন। যুগ যুগ ধরে সর্বকালের ইতিহাসেই আছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। তবে একটা সময়ে নারীর অত্যাচার চলত যথেষ্টই, কিন্তু কন্যা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হবার পর বা আগে মেরে ফেলার দৃষ্টান্ত ছিল না।

সমাজ তো গতিশীল। এক সময়ে যা হয়ে থাকে, পরবর্তী সময়ে তা বদল হয়। সমাজ যতই অত্যাধুনিক, প্রগতিশীল শিক্ষিত হোক না কেন, নারীজাতির ওপর যে চিরাচরিত মনোভাব তা অটুট। সেখানে উদার শিক্ষার কোনও প্রতিফলন দেখা যায় না। বরং আধুনিক চিকিৎসার উন্নতিতে কন্যা- সন্তানকে জন্ম দেওয়ার আগেই বিনষ্ট করার উপায় তৈরি হয়েছে। তা হলো আল্ট্রা-সোনোগ্রাফি। কন্যাভ্রূণ বিনষ্ট করার প্রবণতা বেড়েছে। এর ফলে পরবর্তীকালে জনগণনায় দেখা গেছে, জনসংখ্যায় পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা কম। এতো একটা দিক।

যে সব মহিলা পৃথিবীর আলো দেখতে সক্ষম হয়েছে, তাদের উপর সমাজবাগীশদের নির্দেশ

হলো বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে হবে মেয়েদের স্থান। সংসারের যাবতীয় কাজ, সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন করা হবে তাদের লক্ষ্য। শিক্ষার আলো যেন তাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। সেই কারণেই শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামেগঞ্জে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি।

কিন্তু সময় তো এক জায়গায় থেমে থাকে না। সময়ের বির্বতনে নারী তার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ঘেরাটোপের বাইরে এসে স্বাধীনতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। তার নিজস্ব অধিকার অর্জন করেছে। মহিলারা শিক্ষার আলো পেয়ে অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা অভিযান চালিয়ে মহিলারা অনেকেই সাক্ষর হতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকী বয়স্ক শিক্ষা প্রচলন করে গ্রামের গৃহবধূরা, শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা নিরক্ষরতার বদনাম ঘুচিয়েছেন। আজ আর তাঁরা পরিবারের স্বামীদের চোখ রাঙানিকে ভয় পান না। নারী প্রগতিশীলতার এ এক উন্নত পদক্ষেপ।

এই আলোচনার ভিত্তিতেই প্রকাশিত ২০১১-র এক সমীক্ষায়, রাজ্যের জনগণনা ও সাক্ষরতার ব্যাপারে যে তথ্য মেলে তা তুলে ধরা হচ্ছে। জনগণনায় উদ্বেগজনিত ঘটনা এই যে, ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্যের হার গত দশকের অর্থাৎ ২০০১-র তুলনায় সারাদেশে প্রতি হাজারে ছেলে শিশুর তুলনায় কন্যা সন্তানের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ৯২৭ থেকে কমে ৯১৪-তে দাঁড়িয়েছে। জনগণনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা জানিয়েছেন ইউনিসেফের আধিকারিকরা। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় এ রাজ্যে শিশুদের মধ্যে কন্যা সন্তানের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এর পেছনে যে কারণ আছে তাতে দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত আলোচনায় কারণগুলিই উঠে আসছে। এর কারণ হলো, মহিলা ভ্রূণহত্যা, ভ্রান্ত পরিবার পরিকল্পনার নীতি। তবে সমীক্ষায় এ রাজ্যের পক্ষে সুখকর সংবাদ হলো, রাজ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে দেশের হার যেখানে ৬৫ শতাংশ, সেখানে রাজ্যের হার ৭১ শতাংশ। সারা দেশের তুলনায় সার্বিক সাক্ষরতায় এগিয়ে থাকলেও জাতীয় যোজনা কমিশনের লক্ষ্যমাত্রা ৮৫ শতাংশ যেখানে, সেখানে রাজ্যের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৭৭.০৮ শতাংশ। এর সঙ্গে আরেকটি সুখবর তুলে ধরেছেন রাজ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগের কমিশনার দিলীপ ঘোষ—সেটি হলো, বর্তমানে কন্যা শিশু মৃত্যুর হার এবং মহিলা মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে।

এইভাবেই যেন নারী প্রগতি ঘটে এবং মহিলারা আরও বেশি সাক্ষর ও শিক্ষিত হয়ে আত্ম সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষাবর্গ সম্পন্ন

দেশের চারদিক থেকে যে সমস্ত সংবাদ আজ আসছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের। রাতের অন্ধকারে দেশের সরকার পুলিশ পাঠিয়ে এমন লোকেদের উপর হামলা চালায় যারা তাদের মনের কথা জানানোর জন্য শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহে সমবেত হয়েছিল। এটা জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং জরুরী অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এই কাজের ভর্ৎসনা করছি।

গত ৬ জুন নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এভাবেই সঙ্ঘের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে কাঞ্চী কামকোটী পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতী আশীর্বচন দেন। বিজয়ওয়াড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহসভাপতি ড. গঙ্গারাজু প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেকুলারিজমের নামে সংখ্যালঘু তোষণে ব্যস্ত। তিরুপতির মতো হিন্দু মন্দিরের সম্পত্তি খৃস্টানদের দিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী ধ্বজোত্তোলন ও প্রার্থনার পর শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকেরা শারীরিক প্রদর্শন করেন।

গত ৯ মে প্রতিবছরের মতো এ বছরও নাগপুরে একমাস ব্যাপী এই বর্গের শুরু হয়। দেশের ৩৯টি প্রদেশ (সাংগঠনিক) থেকে মোট ৭৩৮ জন শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবক এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের ২০ জন এবং উত্তরবঙ্গের ৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। ইংল্যান্ড থেকে ২ এবং নেপাল থেকে ৪ জন স্বয়ংসেবকও এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। সব থেকে বেশী শিক্ষার্থী এসেছেন কেরল প্রদেশ থেকে—৬৫ জন। উল্লেখ্য, এই বর্গের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাগপুরের মেয়র শ্রীমতী অর্চনা ধেহানকর (Dehankar)। বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন, সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী, স্বামী গোবিন্দগিরি মহারাজ প্রমুখ। এবছর এই বর্গের পালক বা সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন টি ভি দেশমুখ, কার্যবাহ শশীকান্ত দীক্ষিত এবং মুখ্যশিক্ষক ও কে মোহনন। উল্লেখ্য, এই বছর সারা দেশে ৬৩টি সঙ্ঘ-শিক্ষাবর্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

গত ৫ জুন রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরে উদ্বোধন হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গের প্রথম বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ। উদ্বোধনী কার্যক্রমে

অরণ্যষষ্ঠী উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপন।

ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার ও পূর্ব সহক্ষেত্র প্রচারক অজিত প্রসাদ মহাপাত্র। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রবীর মিত্র। উত্তরবঙ্গের ১০টি জেলা থেকে ৬৭ জন এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২ জন শিক্ষার্থী এই বর্গে অংশগ্রহণ করেছেন। মোট ৩৪ জন প্রবন্ধক ও ১৪ জন শিক্ষক বর্গ পরিচালনায় রয়েছেন। ২০ দিনের এই প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে বর্গাধিকারী হিসাবে রয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং বর্গকার্যবাহ দেবব্রত দাস। মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন মালদা জেলা প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরা। বৌদ্ধিক প্রমুখ অঙ্কুর সাহা ও সহবৌদ্ধিক প্রমুখ সমীরণ মাজী এবং সর্বব্যবস্থা প্রমুখ ছিলেন রাজবলী পাল। উল্লেখ্য, গত ৭ জুন অরণ্যষষ্ঠী উপলক্ষে রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে পেয়ারা, ডালিম ফল ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করেন সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের বর্গাধিকারী, উত্তরবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ, সহপ্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো প্রমুখ। শিক্ষার্থীরাও এই দিনে বর্গপ্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করেন।

সাভারকর জন্মজয়ন্তী

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধা স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১২৯তম জন্মজয়ন্তী হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হলো বাঁকুড়ায়।

২৮ মে বীরসাভারকর সরণীস্থ রাণীগঞ্জ মোড়ে তাঁর ব্রোঞ্জমূর্তির পাদদেশে মন্মথ দত্তর পরিচালনায় লাঠি-ছোরা খেলা প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যায় জনসভায় সাভারকরের জীবনী ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে বক্তব্য রাখেন প্রাদেশিক

হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি অরূপ মুখোপাধ্যায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষে অবনী মণ্ডল, বিজেপি নেতা চণ্ডী অধ্যয্য, হিন্দুমহাসভার প্রাদেশিক কার্যকরী সভাপতি সোমনাথ বরাট প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন হিন্দুমহাসভা নেতা প্রাক্তন উপ-পৌরপ্রধান ভক্তিপদ পাল।

প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘের উদ্যোগে মেদিনীপুরে সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ

সরস্বতী শিশু মন্দিরের মেদিনীপুরে অবস্থিত পাঁচটি শাখার প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের নিয়ে গঠিত 'প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘ'-র আয়োজনে এবং 'সংস্কৃত ভারতী'র সহযোগিতায় মেদিনীপুরের সিপাইবাজারস্থিত সরস্বতী শিশু মন্দিরে গত ২৩ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ। এই বর্গে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত চল্লিশজন শিক্ষার্থী প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে অভ্যাসের মাধ্যমে সংস্কৃতে কথা বলতে শিখলেন।

গত ১ জুন বুধবার বিকেল ৫টায় এই অনুষ্ঠানের সমারোপ কার্যক্রম সুসম্পন্ন হলো। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আগত মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ তথা সার্জারির বিভাগীয় প্রধান ডা: সুকুমার মাইতি এবং মেদিনীপুরের প্রাক্তন পাবলিক প্রসিকিউটর শ্যামলেন্দু মাইতি এইরূপ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া মেদিনীপুরের পৌরপিতা প্রণব বসু উপস্থিত ছিলেন।

শিবিরের শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত গান, নাটক, অনুভব কথন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে মনোজ্ঞ করে তোলেন। শিশুমন্দিরের এক প্রাক্তন অভিভাবকের উদ্যোগে সমস্ত শিক্ষার্থীর হাতে সংস্কৃত শিক্ষার একটি বই স্মারকরূপে তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে শিশু মন্দিরের আচার্য-আচার্যা, বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যার্থী এবং অভিভাবকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ সমাচার

মঙ্গলনিধি

গত ৬ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল কুমার নাথ তাঁর পৌত্র নিরভ্র-র শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নালাগোলাস্থিত বাসভবনে আয়োজিত এক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি হিসেবে সেবাকাজের জন্য ২০০০ টাকা সেবা ভারতীর পক্ষে উপস্থিত বরিষ্ঠ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে তুলে দেন।

কংগ্রেসীদের জাতির জনক গান্ধী না জিন্না ?

শিবাজী গুপ্ত

গান্ধী-নেহরু গোষ্ঠী যেদিন থেকে কংগ্রেসের হাল ধরেছে, সেদিন থেকে হিন্দুদের ক্ষতি ও সর্বনাশের শুরু হয়েছে। এরা কংগ্রেস দখল করার পর থেকে যে কয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতিটিতেই হিন্দুদের ক্ষতি বই কোনও লাভ হয়নি। খিলাফত আন্দোলন থেকে যে সর্বনাশের সূত্রপাত, মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগ পরিকল্পনায় সে সর্বনাশের পূর্ণাহুতি বলা যেতে পারে।

আবার তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার পর স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনাকালে মুসলমানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইনের ছুতা ধরে যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করা হল, তা ডালপালায় বিস্তৃত হয়ে মুসলিম সংরক্ষণের ধুয়া ধরে পুনরায় দেশভাগের দাবী তোলার পথ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছে। মাইনরিটি কমিশন, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন, সাচার কমিশনের পর হিন্দুরা যাতে এর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারে তজ্জন্য 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' বিরোধী আইন প্রণয়ন করার তোড়জোড় চলছে। এককথায় হিন্দুদের স্বার্থহানি এবং মুসলমানদের স্বার্থসিদ্ধি করার বিভেদপন্থী নীতি কংগ্রেসীরা যেন উত্তরাধিকার সূত্রে বৃটিশের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও দেশভাগের মন্ত্রণাদাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের মুখপাত্র মি. জিন্নার কাছে কংগ্রেসীরা ও তাদের দলছুট নেতা- নেত্রীদের চৌদ্দ পুরুষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। দুর্বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে মুসলমানরা যদি হিন্দু-শিখদের কোতল করতে শুরু না করত এবং নিজেদের দাবী মতো দেশভাগ ও পাকিস্তান না পেলে হিন্দু-শিখ হত্যা চালিয়েই যাবে বলে হুমকি না ছাড়ত, তাহলে গান্ধীর মানসপুত্র নেহরুর পক্ষে খণ্ডিত ভারতের

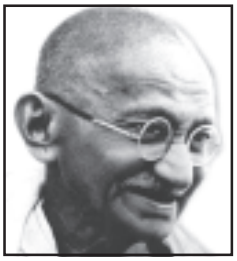

গান্ধী

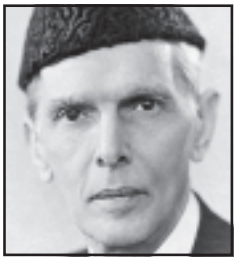

জিন্না

প্রধানমন্ত্রীর গদি দখলের এবং দিল্লীতে গান্ধী-নেহরু গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক শাসনক্ষমতা ভোগ দখলের কোনও সম্ভাবনাই থাকত না। সে কারণেই মি. জিন্না ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কাছে কংগ্রেস ও নেহরু গোষ্ঠীর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সুতরাং দেশের মাটির জন্য দরদ, লক্ষ লক্ষ হিন্দু-শিখ নরনারীর অকালমৃত্যু ও নৃশংস অত্যাচারের জন্য মর্মবেদনা—কিছুই সেকালের কংগ্রেসীদের মধ্যে দেখা যায়নি। তারা তড়িঘড়ি গদিতে বসার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, দেশভাগের পরিণতিতে দুই কোটি হিন্দু-শিখের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার তখন অবসর কোথায়? কংগ্রেসী পালের গোদা নেহরু তো তখন বড়লাট-পত্নীর বাহুবন্ধনে কোঁৎ কোঁৎ করছেন।

সুতরাং বাংলা ও পাঞ্জাবের নিরপরাধ হিন্দু-শিখ নরনারী শিশুর রক্তে ভারতভূমির মাটি যত পিচ্ছিল হয়েছে, নেহরুর গদি লাভের পথও তত মসৃণ হয়েছে। সে কারণেই গান্ধীর পরিবর্তে মি. জিন্নাই কংগ্রেসীদের কাছে জাতির পিতা রূপে স্বীকৃতি লাভের দাবী রাখে।

কংগ্রেস নেতারা আত্মশক্তির উপর আস্থা না রেখে, হিন্দুদের আত্মরক্ষার আহ্বান না জানিয়ে—রাজনীতিতে শঠে শাঠ্যং নীতি অবলম্বন না করে, হাত কচলানো ও হাত জোড় করার নপুংসকনীতি অবলম্বন করে হিন্দু ও হিন্দুস্থানের সর্বনাশ ত্বরান্বিত করেছেন। গান্ধী একাদিক্রমে ১৮ দিন জিন্নার দুয়ারে ধর্না দিয়ে খালি হাতে ফিরেছেন—এটা নাকি তাঁর জীবনে বিরাট অ্যাচিভ্‌মেন্ট— ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার বাহিনীর হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে বৃটিশ বাহিনীর সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদ্‌পসরণের সমতুল্য!

অতীতে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে জিন্না ও মুসলিম লীগের কাছে ধর্না ও হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করেছিল গান্ধীমার্কা কংগ্রেসীরা। তারা হিন্দুদের বুকে ছোরা মেরে তার জবাব দিয়েছিল। বর্তমানে মুসলিম ভোটের জন্য ডান বাম সব দল মুসলমানদের কাছে ভোটের জন্য হাতজোড় ও পায়ে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। তার ফলে যারা পশ্চিমবঙ্গে (বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ছাড়া) গত নির্বাচনে কুষ্ঠরোগের দুষ্ট ক্ষতের মতো ৬০টি সবুজ চারণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের যে ক্ষয় রোগে ধরেছে, তার থেকে নিরাময়ের আশা নেই। কারণ হিন্দুরা নিজেদের তৈরি রোগেই ভুগছে।

নাদাল কি বর্গের সমকক্ষ হতে পারবেন?

ক্লে কোর্টের অবিসম্বাদী সম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রাফায়েল নাদাল। এবছর ফরাসী ওপেনের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রজার ফেডেরারকে দীর্ঘ পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হার মানাতে বাধ্য করেন স্পেনের 'আর্মডারা'। এর সঙ্গেই টেনিস 'মিথ' বিয়ন বর্গের ৬ বার ফরাসী ওপেন খেতাব জয়ের অনন্য সাধারণ নজীর স্পর্শ করে ফেললেন। টেনিস সমালোচকরা এখনই তাকে বর্গের পাশে বসিয়ে তুল্যমূল্য বিচার শুরু করে দিয়েছেন। এই তুলনা কতটা যুক্তিসঙ্গত, কতটা প্রাসঙ্গিক?

গত শতাব্দীর সাতের দশকে বর্গ তার যাবতীয় ঐশ্বর্য ও মহিমা মেলে ধরে বিশ্বজুড়ে টেনিস যোদ্ধা ও দর্শককে আবিষ্ট করে রেখেছিলেন। জীবনের প্রথম উইম্বলডনে তাঁকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন ভারত। প্রেমজিৎলাল চার ঘণ্টার ম্যারাথন ম্যাচ শেষ পর্যন্ত তরুণ তুর্কী বর্গ বের করতে সমর্থ হয়েছিলেন রিফ্লেক্স ও স্ট্যামিনার জোরে। প্রেমজিৎ তখন টেনিস জীবনের উপান্তে পৌঁছে গেছেন। ওটাই ছিল তাঁর শেষ উইম্বলডন। তাও মধ্যজীবনেও বর্গকে টেনে নিয়ে গেছিলেন টাইব্রেকারে। আর ওই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ম্যাচটিই পরবর্তীকালে বর্গের অপরাজেয়, দুর্দমনীয় 'কিলার ইনস্টিংট' গড়ে দিয়েছিল।

পরিবর্তিত ও পরিশীলিত বর্গ তারপর ১৯৭৬-৮০ টানা পাঁচ বছর অল ইংল্যান্ডের রাজা হয়ে বিচরণ করেন। একই সময়ে প্যারিসের রোলাগাঁরোর ক্লে কোর্টেও সমদক্ষতা দেখিয়ে বর্গ তার একাধিপত্য জারি রেখেছেন। আবার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে সিন্থেটিক কোর্টেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে বর্গ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে তাঁর প্রাধান্য তুলে ধরতে পারেননি। যা করে দেখাতে পেরেছেন নাদাল। নাদাল উইম্বলডনের ঘামের কোর্ট প্যারিসের ক্লে কোর্ট, হার্ড কোর্টে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ও মেলবোর্নের ফ্লিডার্ন পার্কে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সর্বত্র তাঁর জয়পতাকা উড়িয়েছেন। তা বলে এখনই নাদাল; বর্গের সঙ্গে তুলনায় চলে আসবেন না। যদিও বর্গ ও নাদাল দুজনেই ২৫/২৬ বছর বয়সেই সমসংখ্যক গ্রান্ডস্লাম খেতাব নিজের ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে ফেলতে পেরেছেন। কিন্তু বর্গের সময়ে টেনিসবিশ্ব অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। তাঁকে ক্লে কোর্টে 'গ্রেট মাস্টার' গিলারমো ভিলাস, ইলি

বর্গ

নাদাল

নাসতাসে, স্যাময়েল সান্তানার মোকাবিলা করতে হয়েছে। অন্যদিকে গ্রাস ও হাউকোর্টে তাঁকে সামলাতে হয়েছে জিমি কোনর্স, রসকো ট্যানার, ভিটাস গেরুলাইটিক্স, ইয়ান টিরিয়াক, আর্থার অ্যাশকে। এছাড়া আরও নানা দেশের অসাধারণ সব খেলোয়াড় ছিলেন তখন পেশাদার সার্কিটে।

এ টি পি ও গ্রান্ডস্লাম সার্কিটের পাশাপাশি ডেভিসকাপে সুইডেনকে টেনে নিয়ে গেছেন বছরের পর বছর। বর্গের কীর্তিকল্প অনুসরণ করে উঠে আসেন স্বদেশীয় ম্যাটস ভিল্যাডার, স্টিকাস এডবার্গ, অ্যান্তার্স জ্যারিডের মতো চ্যাম্পিয়ানরা। এখানেই বর্গের কৃতিত্ব। যে কিনা নিজের প্রচ্ছায়া দিয়ে গোটা দেশের একটা প্রজন্মকে অনুরণিত করে জীবনের সঙ্গে টেনিসকে একাত্ম করে দিতে পেরেছেন। বস্তুত বর্গের উত্থানের পর থেকেই বিশ্ব টেনিসে সুইডেন কৌলীন্যলাভ করে। তার আগে দেশটি টেনিস কৌলীন্য বলতে কিছুই ছিল না। আর বর্গের খেলাও ছিল রামধনুর সাত রঙের বর্ণচ্ছটার মতো। সব ধরনের কোর্টে খেলার মতো উদ্ভাবনী সৃজন ও টেকনিক্যাল উৎকর্ষের পরাগ বৈচিত্র্য। আক্রমণ-রক্ষণে চমৎকার ভারসাম্য দেখিয়ে স্বল্পকালীন টেনিস জীবনে একের পর এক আইভরি কীর্তি রচনা করেছেন। সমকালীন সব বিখ্যাত তারকাকে একপ্রকার নিজের শৈলী ও বিক্রমে বশীভূত করে রেখেছিলেন।

বর্গের 'ম্যাজিক' বা 'মিডাসটাচ' সমসাময়িক টেনিস সংস্কৃতিকে এক অন্যমাত্রা, ঘরানায় উন্নীত করেছিল। সেদিক থেকে দেখলে নাদাল তার ক্যারিসমা দিয়ে এখনও টেনিস বিশ্বকে শাসন করার জায়গায় আসেননি। যা দেখা গেছে রজার ফেডেরারের খেলায়। ক্লে কোর্ট ছাড়া সব ধরনের কোর্টে, সব মানের টুর্নামেন্টে রজার অনেকটা বর্গের মতো অনতিক্রম্য, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করে আটকে দিয়েছেন জাঁদরেল সব প্রতিপক্ষকে। আর ফেডেরার ছাড়া সাম্প্রতিকালে নোভাক ডকোভিচও নাদালকে চাপে ফেলে দিয়েছেন বহুক্ষেত্রে। অ্যান্ডি রডিক, অ্যান্ডিশারে, লেটন হিউইট, ডেল পোর্তোর মতো একালের বেশ কয়েকজন তারকা নাদালকে ক্লে কোর্ট ছাড়া বাকি সব সারফেসে হারিয়েছেন মাঝেমধ্যেই। তবে নাদাল একটা দুর্মূল্য রত্ন স্বোপার্জিত করেছেন মাধুকরী উজ্জ্বল্যে।

সেই রত্নটি লে অলিম্পিক সোনা। বেজিং অলিম্পিকে নাদাল সোনা জিতে ছাপিয়ে গেছেন ফেডেরার, ডকোভিচকে। বর্গের সময় অবশ্য টেনিস অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাহলে হয়তো অলিম্পিকে দেখা যেত বর্গের বিক্রম। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ছাড়া দুনিয়া জোড়া সব টুর্নামেন্টে বর্গের সচল রথ তরতরিয়ে চলেছে। তার তুলনায় রাফায়েল নাদালের ট্যুরসার্কিটে পদচারণা অনেকটাই গতি মন্থরতায় আচ্ছন্ন। তাই প্যারিসের ক্লে কোর্টে বর্গের রেকর্ড স্লথ করলেও ওখানে নাদাল এখনও বর্গের তুলনায় খানিকটা পিছিয়েই আছেন।

শব্দরূপ-৫৮৬ **ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া**

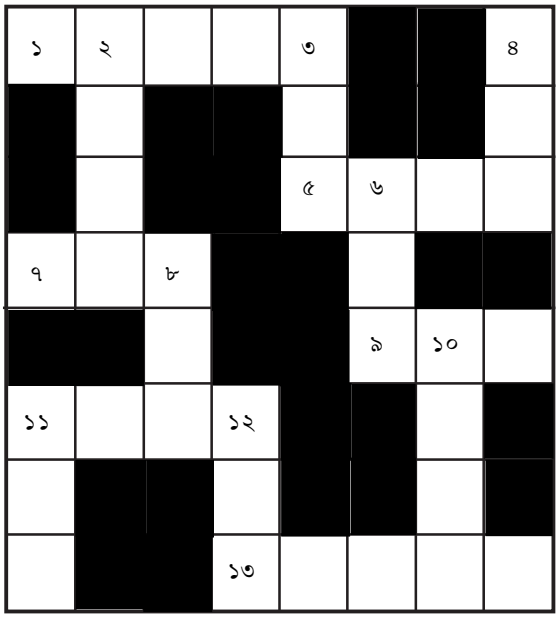

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অশ্রদ্ধাপ্রদত্ত রাজভোগ অপেক্ষা প্রীতিদত্ত নিকৃষ্ট ভোজ্যের শ্রেষ্ঠতা ও উপাদেয়তা (প্রবাদ); বিদুর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত দীনজনোচিত খাদ্য, **৫.** বাণভট্ট প্রণীত কথাগ্রন্থ বিশেষ, **৭.** বনে উৎপন্ন, বনজাত, **৯.** খতম, শেষ, নাশ, **১১.** জনৈক ব্যাধপুত্র যিনি ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর, মহাদেবের শাপে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন, **১৩.** শালগ্রামশিলা।

উপর-নীচ : ২. ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, **৩.** সহসা বেগবান (‘—হাওয়া’), **৪.** বর্ষাকালে গেয় একপ্রকার সংগীত, **৬.** নিঃস্রাব; পূঁজ—রজাদির নিঃসরণ, **৮.** ‘‘বেলা যে পড়ে এল, সখী,—চল’’, **১০.** চুলাচুলি, **১১.** অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত সন্তান, যেমন মহাবীর কর্ণ, **১২.** অশ্ব।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

পা	ট	লি	পু	ত্র	■	■	সু
■	ষ্ক	■	■	স	■	■	ষে
■	প	■	■	র	জো	গু	ণ
পে	তি	নী	■	■	য়া	■	■
■	■	রো	■	■	ল	কু	চ
কো	জা	গ	র	■	■	ব	■
দ	■	■	স	■	■	ল	■
গু	■	■	দ	ক্ষি	ণা	য়	ন

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

● ৫৮৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ জুলাই, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ৯

Swastika RNI No. 5257/57
20 June - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

গর্জে উঠুক বিপুল জনতা

কেউ কেউ বলছে যে এবার — 'এক জাতি এক প্রাণ' কেন হবে না? কেন হবে না Common Civil Code? কেন হবে না সকল ভারতবাসীর জন্য এক আইন? স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও যদি না হয় তাহলে যে মহাবিপদ সামনে এগিয়ে আসছে, আমরা তার থেকে মুক্ত হব কিভাবে? এই সমস্যার কথা — এবার বিপুল জনতার সামনে, প্রচারের মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব, ক্রমাগত — বছরের পর বছর। জনতা বিচার করবে, কী করা যায়। কেমন করে আন্দোলন করা যায়। এভাবেই একদিন ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে জনতার মাঝখান থেকে। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চাই (Common Civil Code চাই), সংখ্যালঘু তকমার বিলুপ্তি চাই। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক আইন চাই। এ লড়াই বিপুল জনতার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Forum of Nationalist Thinkers, প্রচারের কাজ শুরু করেছে। সকলের যোগদান আহ্বান করছে। সকলের সবরকম সাহায্য প্রার্থনা করছে। এ লড়াই আমাদের সকলের। হিন্দুস্থান অমর রহে। বন্দেমাতরম্।।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন

প্রধান নির্দেশিকা (ইস্যু) মাত্র দু'টি

এক - শাসকের সর্বস্তরে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

দুই - অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (Common Civil Code)

-- Courtsey --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS

12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069
Mob. : 9051498919 / 9433047202

দাম : ৫.০০ টাকা